প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম

সিদ্ধার্থ চাকমা

-:- পরিবেশক -:-
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৯২

প্রচ্ছদ : সমরেশ সাহা

প্রকাশক :
জয়ন্ত সাহা
পো : মল্লিকপুর, ২৪ পরগণা (দঃ)

মুদ্রক :
এম. এম. ট্রেডার্স
৩/২, ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

মানবতার গ্লানির শেকল ছেঁড়ার গান যাঁরা
বিশ্বের দুর্বলতম মানুষদের শিখিয়েছেন
নিজেদের জীবন দিয়ে

In the fabric of human events, one thing leads to another. Every mistake is, in a sense, the product of all the mistakes that have gone before it, from which it derives a sort of a cosmic forgiveness ; and, at the same time, every mistake is, in a sense a determinant of the mistakes of the future, from which it derives a sort of a cosmic unforgivableness.

—George F. Kennan

সূচীপত্র

ভূমিকা

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই বিভিন্ন কারণে লেখা হয়ে থাকে। কোন বিষয় সম্পর্কে কারো বিশেষ আকর্ষণ থেকে কেউ লেখেন, আবার কেউ বা লেখেন কারণ রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে পেশাগত কারণেও লেখেন, প্রতিনিয়ত ছাপাতে না পারলে পেশায় পদোন্নতি হয় না। "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামে"র লেখক সিদ্ধার্থ চাকমা দ্বিতীয় কারণে বর্তমান বইটি লিখেছেন। বিষয়টি তাঁর নিকট আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত ভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর চাকমা সম্প্রদায় ভুক্ত। বিষয়টিব উপর যদিও লেখক আগাগোডা তথ্যভিত্তিক নিরপেক্ষ আলোচনার চেষ্টা করেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সংকটের একটি "আভ্যন্তরীণ" দৃষ্টি আমরা তাঁর নিকট থেকে পেয়েছি। স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অচলা-বস্থার ওপরে ইদানিং বিদেশী লেখকের বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ চাকমার বইটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি উপজাতিদের একজন হিসেবে সমস্যাটি বিভিন্ন ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখায়। এই বইটির ভূমিকা লেখার জন্য লেখক আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভাবে দেওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এ সমস্যার কারণ অর্থ-নৈতিক। আবার কেউ কেউ ঐতিহ্যগত উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থাকে এজন্য দায়ী করতে চান। স্বাধীনতা উত্তর কালে উপজাতি অসন্তোষকে আইন শৃঙ্খলার অভাব জনিত সমস্যা হিসেবেও বিভিন্ন সরকার দেখার চেষ্টা করেছেন। আইন শৃঙ্খলার অবনতি রুখতে গিয়ে মিলিটারি অপারেশনের ফলে হাজার হাজার উপজাতি নিহত হয়েছেন; অত্যাচার, লুণ্ঠন ও উপজাতি মহিলাদের ধর্ষণের অভিযোগ দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এরপরও মিলিটারি সমস্যার সুরাহা হয় নি। শেষ পর্যন্ত এ বছরের

এপ্রিল মাসে শান্তিবাহিনীর একটি অংশ (প্রীতিগ্রুপ) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অবস্থাকে দ্বিপাক্ষিকভাবে স্বাভাবিক করার জন্য। সুতরাং সমস্যাটি আইন শৃঙ্খলার নয়, অসন্তোষের কারণ আরো ব্যাপক যা খুঁজে দেখার চেষ্টা এ বইতে করা হয়েছে।

উপজাতি অসন্তোষের একটি ঐতিহাসিক দিক লেখক আলোচনা করেছেন। তবে মূলতঃ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল ১৯৬১সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, কর্ণফুলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম শিল্পায়ন নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় লক্ষাধিক উপজাতি গৃহহারা হন এবং তাঁদের ঐতিহ্যগত অর্থনীতি ব্যাপকভাবে সীমিত হয়ে যায়। নতুন শিল্পায়ন নীতির ফলে শ্রমজীবি হিসেবে প্রচুর বহিরাগতদের সমাবেশ ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে। অথচ শিল্পায়নের কোন সুফল উপজাতি কোনদিন ভোগ করতে পারেনি। শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে সব কর্মচারিরাই বহিরাগত ছিল। পাকিস্তান আমলে বটেই, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও শেখ মুজিবর রহমান থেকে শুরু করে সব মিলিটারী সরকার ভুলের পর ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শেখ মুজিবের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উৎসাহে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বহিরাগত পুনর্বাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপজাতিরা সবসময় সচেতন ছিল। ফলে উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উপজাতি সম্প্রদায় সরকারী উদ্যোগকে তাদের স্বাতন্ত্র ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকি বলে মনে করে। ক্রমশঃ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে। উপজাতি জনগণ ও সরকার উভয় পক্ষই অস্ত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন এবং লেখকের ভাষায়, তাও ভুল পদক্ষেপ ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এখন যে জটিল আকার ধারণ করেছে তার জন্য লেখকের মতে, আংশিক ভাবে দায়ী উপজাতি নেতৃত্ব। নিজেদেরকে সব সময় আলাদা ভাবে দেখেছেন উপজাতি নেতারা। সারা দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজ-নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে দেখার চেষ্টা উপজাতি নেতারা কোনদিন করেন নি। কেন তাঁরা নিজেদের আলাদা ভাবে দেখেছেন এবং নিজেদের মতো করে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন, তার কারণগুলো লেখক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন যা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য কোন বইতে আমরা দেখতে পাই না। লেখক আমাদের দেশের

জাতীয় রাজনৈতিক দল সমূহ ও নেতৃত্বকে বিশেষ ভাবে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় চিন্তা চেতনার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপজাতিরা ক্রমশঃ দূরে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ জাতীয় নেতৃত্বের উপজাতিদের সমস্যার শেকড় খুঁজে তার গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধির ব্যর্থতা, কিংবা উপজাতি সমস্যার প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এ সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব? উপজাতিদের ৪টি মূল দাবি রয়েছে: এক। বহিরাগত শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ করা, দুই। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়া, তিন। উপজাতিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া, এবং চার। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন। প্রীতিগ্রুপ ও সেনাবাহিনীর এপ্রিল চুক্তি মোতাবেক বহিরাগত পুনর্বাসন বন্ধ করা হবে এবং বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, উপজাতিদের বেদখলকৃত জমি জমা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে মালিকের কাছে হস্তান্তরের অংগীকার করা হয়েছে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা চুক্তিতে নেই। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন পরামর্শের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে উপজাতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা নেওয়া হবে এবং উপজাতি জনগণের স্বার্থে "সংশোধিত" পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ শীঘ্র প্রকাশ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বলতে কি বুঝায়? এটা কি ধরণের স্বাধীকার? পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শাসিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঞ্চলিক শাসনের রূপরেখা কি হবে, স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নে উপজাতিদের কি ভূমিকা হবে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব ও শিক্ষানীতি উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট রক্ষায় কতটুকু উপযোগী—এ সব বিষয় আলোচনা ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা স্বায়ত্বশাসনের পরিধি নির্ধারণে সহায়ক হবে। সম্পূর্ণ বিষয়টি রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই স্পর্শকাতর। বিষয়টি আমাদের দেশের রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাশাপাশি ভারতে মিজো বিদ্রোহ এবং বার্মার আরাকান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে। এই তিন এলাকার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগের কথাও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। এছাড়া লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এ ধরণের ক্ষুদ্র জাতিভিত্তিক সশস্ত্র আন্দোলনকে রাজনৈতিক-

ভাবে কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সব সময় প্রচেষ্টারত। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট নিরসনে উপজাতি নেতৃত্ব, জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সরকারের সম্মিলিত ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেওয়া আশু প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোতেই এই সংকটের মীমাংসা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টার এবং সমস্যাকে জানার নিরলস প্রচেষ্টার। লেখক তাঁর "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম বইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং উপদলীয় কোন্দলের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এতে অনেক দিক থেকে বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে সমস্যাটির ব্যাপকতা ও তাৎপর্য্য বুঝতে সুবিধা হয়েছে। লেখক নিজে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী হওয়ায় তথ্য সংগ্রহে তাঁর সুবিধা ছিল, এবং সাহস নিয়ে তা তিনি প্রকাশ করেছেন। অনেক পেশাগত গবেষক হয়ত বা এত সাহসী হতেন না।

কানাডা,
১লা নভেম্বর, ১৯৮৫।

এম. কিউ. জামান
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, মেনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা
এবং
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

কিছু কথা

যে দু'টো প্রশ্ন প্রথম থেকেই মনের মধ্যে আছে এ লেখা প্রকাশ করার ব্যাপারে সে দুটোই গোড়াতে বলে নেওয়া দরকার। প্রথমটা, অবধারিত ভাবেই হল—কেন এই লেখা। দ্বিতীয়টা হল, এই লেখা আবার বোঝা পাঠকের ওপর সেই প্রবাদবাক্যের বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে যাবে নাত? কেন লিখলাম, তার উত্তর বোধহয় লেখার শিরোনামের মধ্যে আছে। কিন্তু যদি পাল্টা প্রশ্ন করা হয় আমার যোগ্যতা সম্পর্কে, তাহলে সবিনয়ে স্বীকার করতেই হয় আমার লেখার সীমিত যোগ্যতা। এমন কি, ছাপার হরফে কোনও বড় লেখাই লিখতে পারিনি এর আগে। তবু এ স্পর্ধার কারণ 'ক্ষণিকা'র রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যারবির কাজ মাটির প্রদীপের নেওয়ার ইঙ্গিত। নিরুত্তর ছবি জগতের যদি এতটুকুও চেতনার সঞ্চার করা যায় এই ছোট্ট অঞ্চলের দিকে তাকাতে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বাঙালীর এক হাত মগেরে রুখেছিল, আর হাত মোগলকে। কিন্তু মোগলকে রোখার পর যে সভ্যতা সংস্কৃতির লীলাভূমির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল সেটা কিন্তু মগকে রোখার জায়গা পর্যন্ত পৌছায়নি। তাই ত্রিপুরার দক্ষিণে, মিজোরামের পশ্চিমে আর ব্রহ্মদেশের পূর্ব-উত্তরে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের মূল ভূখণ্ডের জনজীবনের মূল স্রোত থেকে এক বিছিন্ন অস্তিত্বই থেকে গেছে চিরকাল। তিন রাজা, তার তের সম্প্রদায়, ভাষা আর রীতিনীতিও বিভিন্ন, নিজ নিজ সমস্যা নিয়েই ব্যাপৃত থেকে গেছেন আগাগোড়া। বৃটিশ শাসকেরা দেখেছিলেন রাজার রাজত্ব মেনে নিলেই নির্ঝঞ্ঝাটে থাকা যায়। সুতরাং 'সাদা জনগণের বোঝা' হওয়ার সৌভাগ্য থেকে রক্ষা পেয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় জাগরণের প্রথম পর্বের নব উন্মেষের লোহিত ছটা ভারতের পূর্ব দিগন্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকেও রাঙিয়ে

দিয়েছিল। বড় আশা নিয়েই এখানকার সংশয়গ্রস্ত জনগণ তাঁদের নেতা পাঠিয়েছিলেন বোম্বাই ও দিল্লিতে আন্দোলনের প্রকৃতি ও রূপরেখার সঙ্গে পরিচিত হতে। আর তাতে তাঁদের সঠিক ভূমিকা খুঁজে পেতে। জাতীয় কংগ্রেসের সামনে তখন অনেক কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সে কাজের নাগাল পেল না। আশা বেশী ছিল। বঞ্চনাটাও তাই বেশী করে বেজেছিল বুকে। পরিচিত পরিবেশের খোলস ছেড়ে অচেনা দিগন্তে নতুন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার প্রথম প্রচেষ্টার ব্যর্থ পরিণতি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের আবার খুব বেশী করে তাঁদের নিজেদেরকেই আঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করল।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের সৃষ্টিলগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা হঠাৎই জানতে পারলেন, তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক। কেন হল, কি করে হল—এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? দেশ বিভাগের এই যে দায় তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল, যার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিরোধের ক্ষীণ প্রচেষ্টা তাঁদেরকে যেমন একদিকে করে তুলল সন্দেহের পাত্র পাকিস্তানের চোখে—অন্যদিকে এটাই তাঁদের করল আরও অন্তর্মুখীন। বাইরের জগতের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি হল আরও গভীর। বাংলাদেশের সৃষ্টিলগ্নেও এর পরিবর্তন হলনা। মুক্তি যুদ্ধের পরে কিছু নেতার কথাবার্তা তাঁদের কাজে পাঞ্জাবী জাত্যাভিমান থেকে বাঙালী-জাত্যাভিমানে উত্তরণ বলে মনে হল। আর তখন থেকেই শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা, যা আজ তাঁদের অস্তিত্বের গভীর শেকড় ধরে টান দিয়েছে।

ইতিহাসের এই পটপরিবর্তনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের নিঃশব্দ আর্তি বড় গভীর ভাবে দেখেছি আমি বিগত দুই দশকের কিছু বেশী সময়। একের পর এক ধাক্কা খেতে খেতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁরা প্রায় উদ্‌ভ্রান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। যুগটা প্রস্তর যুগ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহ হিংস্র নরখাদক জাতি নয়। যাযাবর বৃত্তিও তাঁদের এখন আর নেই। বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যে নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা মানুষের দরবারে উপস্থিত হতে চান। অথচ পারছেন না। এই তীব্র যন্ত্রণার জীবনবোধই এ লেখার শুরু।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণে, মিজোরামের পশ্চিমে, বর্মার পুর্ব-উত্তরে ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের পুর্বে বাংলাদেশের দক্ষিণ পুর্ব ২১°৩৫ এবং ২৩°৪৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১°৪৫ এবং ৯২°৫০ পুর্ব দ্রাঘিমাংশে ৫০৯১ বর্গমাইল এলাকা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। বর্তমানে যা তিনটি জেলায় বিভক্ত খাগড়াছড়ি বান্দরবন ও রাঙামাটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম)। তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জাতিগত ভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর তেরটি সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় অভিন্ন সমস্যায় বিপর্যস্ত। তাই তিনটি জেলার নাম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ না করে আলোচনার সুবিধার্থে পুর্বতন জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামকেই ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমুহের বাসভুমি এবং আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে ধরা হয়েছে। এ লেখার উদ্দেশ্য সমস্যার সমাধান দেওয়া নয়, সমস্যার মূল খোঁজা। সমাধানের বাস্তবানুগ নীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকার এবং জাতীয় নেতাদের।

আবেগের তাড়নায় নিরপেক্ষতা যাতে হারিয়ে না ফেলি, সেজন্য নির্ভর করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর লেখা বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ, গবেষণামুলক প্রবন্ধ ও দেশের এবং বিদেশের পত্র-পত্রিকার ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ওপর। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্য সতীর্থদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছি। আর প্রেরণা পেয়েছি একাত্তরের কিংবদন্তী পুরুষ ও পঁচাত্তরের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ বঙ্গবীর বাঘা কাদের সিদ্দিকীর কাছ থেকে, যিনিও আজ আমারই মত আরেক সুতীব্র যন্ত্রণাবোধে ক্ষতবিক্ষত। ঋণ স্বীকার করলেই শেষ হবেনা চরম দুঃসময়ের পরীক্ষিত বন্ধু গিয়াসউদ্দীন আহমেদের কথা, যে প্রতিদিনের নির্মম জীবনযুদ্ধে জড়িত থাকা সত্বেও আমার লেখার ক্ষুদ্র শিখাটিকে দিনের পর দিন জ্বালিয়ে রেখেছিল। সাহিত্যিক বন্ধু-দাদা পরেশ সাহা সময় দিয়েছিলেন, ব্যস্ত সময় থেকে বেশ কিছু এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দিতে ও নামকরণে সাহায্য করতে। লেখা তৈরির দিনগুলোতে শ্রীমতি ইন্দুপ্রিয়া চাকমা মায়ের মমতা দিয়ে আমার সব অভাব মিটিয়েছেন। উৎসাহে করেছেন উজ্জীবিত। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা বা সাহস, কোনটাই আমার নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে

আমাকে সকৃতজ্ঞ করেছেন সুহৃদ হাসেমি মাসুদ জামিল যুগল, দীপক চাকমা, এম. এস. দেওয়ান, দেবাশীষ দেওয়ান, কুন্দন চাকমা, সঞ্জয় চাকমা ও সুতপা। সর্বোপরি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আমার এক শ্রদ্ধেয় দাদার, লেখার শুরু থেকে শেষ অবধি সব ক্ষেত্রে সব রকমের সহযোগিতা না থাকলে লেখা আদৌ শেষ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। আমার লেখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল চুরাশিতে। কিন্তু আয়ত্তের বাইরে ঘটে যাওয়া নানা সমস্যার কারণে বইটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর নতুনভাবে কিছু সংযোজন করতে গেলে লেখার অনেক কিছুরও বদল ঘটাতে হয়। আমি নতুন করে কিছু সংযোজন না করলেও অধ্যাপক এম. কিউ. জামান তাঁর লেখা ভূমিকায় সেই পরিবর্তনের রূপ ও ইঙ্গিত দিয়ে লেখাটাতে সাম্প্রতিকতার ছাপ এনে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রকাশনা সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিয়ে আমার বোঝা হাল্কা করে দেওয়ার মাধ্যমে জয়ন্ত সাহা বন্ধুত্বের চরম নিদর্শন রেখেছেন। নাথ ব্রাদার্স পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অনেক দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে গেছে। তার দায়িত্ব একান্তই লেখকের।

শুরুতে দু'টো প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। প্রথমটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়টার উত্তর পাঠকের কাছে।

—সিদ্ধার্থ চাকমা

পূর্ব কথা

সাম্প্রতিক কালের যে কোন দেশের সংবাদ পত্র ও সাময়িকী খুললে চোখে পড়ে উপজাতি অধ্যুষিত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতার খবর। সুদীর্ঘ দিনের শোষণে, বঞ্চনায় ও অত্যাচারে উপজাতি জনগণ মৃতপ্রায়। তাদের সমস্যার উৎস, গতি প্রকৃতির যথার্থ বিশ্লেষণ না করে বর্তমান বিশ্বের এখানে ওখানে সংঘটিত বিভিন্ন সশস্ত্র তৎপরতার একটি রূপে চিহ্নিত করে, ঐ সশস্ত্র প্রতিরোধের পিছনে বিদেশী শক্তির প্ররোচনা ও মদত খোঁজা যেন সরকারের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এই ধরণের সশস্ত্র তৎপরতার পেছনে বিদেশি শক্তির প্ররোচনা ও মদত নেই, এই কথা কেউ বলছে না। তবে, তার সঙ্গে এও সমান সত্য, প্ররোচিত করা বা মদত যোগানোর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চাই। সরকারের ভুলনীতির ফলেই সেই ক্ষেত্র তৈরি হয় কিন্তু শুধু বিদেশি চক্রান্তকে দায়ী করে নিজের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা, হাত বদল করে ক্ষমতায় আসা প্রতিটি সরকারের একটি অঘোষিত নীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই, দেখা যায়, সরকার সমাধানের গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাস্তা না খুঁজে, অস্ত্রের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার সমাধান খুঁজছে। এতে সমস্যা দিনে দিনে আরও

জটিল হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য-জনপদগুলো তাই বিস্ফোরণে কাঁপছে। এতদিনকার শান্ত নিরীহ উপজাতি জীবন অশান্ত হয়ে উঠেছে। উপজাতি জনগণের একটা অংশ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হতাশ হয়ে নিজেদের চরমতম অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে। অস্ত্রের মোকাবিলায় তারাও পাণ্টা ব্যবস্থা হিসেবে হাতে অস্ত্রে তুলে নিয়েছে। উপজাতিদের একটা অংশ এ লড়াইকে মনে করছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার লড়াই। রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্যার সঠিক রূপ, গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করে দীর্ঘদিনের অবহেলায় উপজাতি জীবনে সৃষ্ট দুষ্ট ক্ষতগুলি নিরাময়ের সম্ভাবনা যেমন তিরোহিত হয়নি, তেমনি বন্ধ হয়নি গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উপজাতিদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারাণ্টি দিয়ে জাতীয় জীবনের মূলধারার সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেবার পথ।

বিজ্ঞানের দৌলতে এককালের বিরাট পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। সর্বপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে পৃথিবীর এতদিনের অন্ধকারতম অঞ্চলগুলোও আজ নিভৃত নয়। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রায় ঘুমিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতি-উপজাতি শিক্ষায়, চেতনায় নিজেদের আবিষ্কার করছে। এমন একটি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষাভাষি মংগোলীয় বংশসম্ভূত তেরটি উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নয়, বিস্ফোরনের ভেতর দিয়ে। দৈবাৎ কোন ঘটনায় নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের ভুল নীতি ও ভুল পদক্ষেপে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে উপজাতি জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। বিধ্বস্ত তাদের দীর্ঘদিনের মূল্যবোধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন? কেন বারুদের বিষাক্ত ধোঁয়ায় দুর্বিসহ এবং নিত্যদিন আতংকগ্রস্ত বর্তমান উপজাতি জনজীবন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ফিরে তাকাতে হয় বৃটিশ ভারতের র্পাবত্য চট্টগ্রামের দিকে। বুঝতে হয়, পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে এই জেলার উপজাতিদের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

দেশ বিভাগ এবং তারপর

সতেরই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ। সেই প্রথম ঘোষণা করা হয় যে, চট্টগ্রামের আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। বেঙ্গল বাউণ্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিপের রায় পাকিস্তান বেতার প্রচার করে বটে, তবে সে ঘোষণায় জোর ছিল না। ছিল না স্পষ্টতাও। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান—সৃষ্টি করা হয়েছিল মূলতঃ যে সূত্র ধরে, সেই দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যার পচানব্বই শতাংশ অমুসলিম, ভাষা ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্গত কারণেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই সূত্র বরবাদ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেয়া হল। কেন করা হল, এই নিয়ে ভারত বিশারদ ও ইতিহাসবিদ্‌দের মতের ভিন্নতা রয়েছে। কারো মতে, পূর্বাঞ্চলের খুলনা, সিলেট ও কলকাতা কার ভাগে যাবে, এ প্রশ্ন নিয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি বৃহৎ দল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ—ব্যস্ত থাকার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'ইস্যুটি' তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। কেউ কেউ আবার মত প্রকাশ করেন, পাঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল. ফিরোজপুর জেলার জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে শিখদের ঘন বসতি ছিল। মূল পরিকল্পনায় এই দুই মহকুমাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে জোর গোলযোগ, চরম বিশৃঙ্খলা ও মারাত্মক দাঙ্গা আশঙ্কা করে তৎকালীন পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ইভান জেনকিন্স আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে র‍্যাডক্লিপকে (স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিপ পাঞ্জাব বাউণ্ডারি কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন) অনুরোধ করেন, তাঁকে সীমানা বিভক্তির একটি মানচিত্র যেন আগাম পাঠানো হয়, যাতে তিনি প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনীয় সৈন্য ও পুলিশি ব্যবস্থা নিতে পারেন। র‍্যাডক্লিপের সচিব ক্রিষ্টোফার বীমণ্ট সেই মানচিত্র পাঠিয়ে অনুরোধ রক্ষা করেন। তারিখটা ছিল আটই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ।

সাতচল্লিশ সালের পনের আগষ্ট স্যার ইভান জেনকিন্স পাঞ্জাবের গভর্নর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জায়গায় আসেন মুসলিম লিগ নেতাদের প্রিয় পাত্র স্যার ফ্রান্সিস মুদী। জেনকিন্স অবসর গ্রহণ করার সময় পাঞ্জাব বিভক্তির মূল পরিকল্পনার মানচিত্র ও নোট, ঊদাসীনতার কারণেই হোক কিংবা উদ্দেশ্য-মূলক ভাবেই হোক, তাঁর অফিসে রেখে গিয়েছিলেন। মুদী এই নথিপত্র মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলি খানকে দেখাতে দেরি করেন নি। এই নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নাহ্‌র আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।[১] এই অচলাবস্থা ও মনকষাকষি দূর করার উদ্দেশে মাউন্টব্যাটেন মত প্রকাশ করেন, পাকিস্তানের এক অংশ যদি সীমানা বিভক্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তাহলে সেই ক্ষতি অন্য অংশ দিয়ে পূরণ করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।[২] এই ভারসাম্য নীতির সমর্থনে মাউন্টব্যাটেন তড়িঘড়ি তার পাঠালেন বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেড্রিক বারোসকে তথ্য পাঠাতে, বস্তুত, প্রমাণ করতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিই ন্যায়সঙ্গত। যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, পশ্চাদপদ এলাকার ভৌগোলিক সীমানা সংক্রান্ত তথ্য বারোসের জানা ছিল না। বারোসের রিপোর্ট যখন মাউন্ট-ব্যাটেনের দপ্তরে পৌছাল, তখন র‍্যাডক্লিপ রায় গৃহীত হয়েছে এবং তা প্রকাশ করার জন্য দস্তুরমত সীলমোহর দিয়ে ভাইসরয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। যে জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে র‍্যাডক্লিপ কোন কারণ দেখাতে পারেন নি।[৩] তবে এই সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য ছিল,

"Burrows had explained to me that the whole economic life of the people of Hill Tracts depends upon East Bengal, that there are only one or two indifferent tracts through the jungle into Assam, and it would be disastrous for the people themselves to be cut off from East Bengal. The population consists of less than a quarter of million, nearly all are tribes men, who, if they have any religion at all are Buddhists (and so are technically

১) এইচ. এন. পণ্ডিত, র‍্যাডক্লিপ সোড, চাকমাস রীপ্, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১মে, ১৯৮০

২) এইচ. ভি. হাডসন, দি গ্রেট ডিভাইড, পৃঃ—৩৫৪।

৩) এইচ. এন. পণ্ডিত, র‍্যাডক্লিপ সোড, চাকমাস রীপ, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১মে ১৯৮০

non-muslim, under the terms of Boundary Commission). In a sense Chittagong, the only Port of East Bengal also depends upon the Hill Tracts; for if the jungles of the later were subjected to unrestricted felling, I am told that Chittagong Port would be silt up"১

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্যেও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তি করার স্বপক্ষে দেওয়া যুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই সমস্ত জটিলতার কারণেই সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দ ও পনের আগষ্ট উপমহাদেশ ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল দু' দিন পর, সতের আগষ্টে।

দেশ বিভাগের আগে সারা ভারতবর্ষে বয়ে যাওয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য—জনপদের আপাতঃ শান্ত ও সরল জীবন সৈকতে তেমনিভাবে আছড়ে পড়েনি, যাতে করে জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে এই অঞ্চলের নিবিড় ও অভিন্ন যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারে। কারণটা দ্বিবিধ, সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের প্রধান অন্তরায় ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং অশিক্ষা। এই কারনে এই জেলায় রাজনৈতিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠেনি। অভাব ছিল সারাদেশে সংঘটিত ঘটনা পঞ্জী সম্পর্কে সঠিক ধারনার। সমাজ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ত সর্দার বা রাজাদের অবলম্বন করে ঘুরত তাদের জীবন প্রবাহ। রাজারা ছিলেন এই অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব। রাজাদের নিজস্ব স্বার্থে তৈরি কাঠামো ছাড়া সেখানে সুসংগঠিত দল বা সংগঠন ছিল না। সংগঠন গড়ার বাধা ছিল, প্রথমত রাজারা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার ভয় করতেন, দ্বিতীয়ত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক প্রশাসন, তৃতীয়ত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অভাব, চতুর্থত, দল বা সংগঠন সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের ভীতি।

ব্যাপক বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দু'একজন এগিয়ে আসেন এবং বিশ দশকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি' নামে একটি গণ-সংগঠন গড়ে উঠে। যদিও এর আগে উনিশ শ পনের সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা যুবক সমিতি,'

১। ল্যারি কলিন্স এ্যান্ড ডমিনিক লাঁ প্যায়ারে, মাউন্টব্যাটেন এ্যান্ড দি পার্টিশন, বিকাশ পাবলিসিং, দিল্লী, ১৯৮২, পৃঃ ১৭৮

আরও পরে উনিশ শ আটাশে ঘনশ্যাম দেওয়ানের (দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতে চলে যান এবং ষাট দশকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হন) নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'চাকমা যুবক সংঘ'। সংগঠন দুটির কার্যক্রম ও কর্মবিস্তৃতি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। সংগঠন দু'টি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতি সম্প্রদায় ভিত্তিক, এমনকি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায়, চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণেরও সংগঠন ছিল না। সংগঠনের সদস্যপদ নির্দিষ্ট ছিল চাকমা যুবকদের জন্য। তাই বলা যেতে পারে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি'ই সব সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রথম গণ-সংগঠন। এই সমিতির কর্মকমিটির সভাপতি হন কামিনী মোহন দেওয়ান (পরবর্তীতে এই এলাকার প্রথম নির্বাচিত এম. এল. এ-দ্বয়ের একজন। অপর জন হলেন বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা)। জনসমিতির মূল কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল, স্থানীয় অভাব অভিযোগ দেখাশোনা এবং তা দূর করার চেষ্টায়। প্রথমদিকে জন সমিতির রাজনৈতিক প্রেরণা তেমন তীব্র ছিল না। তাই দেখা যায়, জন সমিতি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি বা যোগাযোগে তেমন আগ্রহী ছিল না। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ পার্বত্য চট্টগ্রামে সঞ্চালিত করার প্রয়াস খুব একটা নেয়নি। অনুশীলন সমিতি এবং উগ্রপন্থী দলের কিছু কিছু সদস্য বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে আত্মগোপন করে থাকার জন্য মাঝে মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতেন। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের যৎকিঞ্চিৎ যোগাযোগ যা ঘটত, তা ছিল দৈবাৎ। ছিল ভাব আদান প্রদানের সুযোগ এবং সময়ের অভাব। তাঁদের সংস্পর্শের ফলে যদিও বা নামে মাত্র যে যোগাযোগ স্থাপিত হত, তাতে আন্দোলনের সামগ্রিকতা ছিল না। ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলের

১) এইচ. ভি. হাডসন, দি গ্রেট ডিভাইড, পৃ: ৩৫৪।

২) এইচ. এন. পণ্ডিত, র‍্যাডক্লিপ সোড, চাকমাস রীপ, অমৃত বাজার পত্রিকা, ১১মে, ১৯৮০।

৩) ল্যারি কলিন্স এ্যাণ্ড ডমিনিক লাঁপেয়ারে, মাউন্টব্যাটেন এ্যাণ্ড দি পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৮২, পৃ: ১৭৮।

৪) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ: ১৭৭।

চিন্তা চেতনার খণ্ডতা ও বিভিন্নতা, যা মূলস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার একপ্রকার অন্তরায়। পরবর্তীতে মুসলিম লিগের জন্ম হলেও দলের নামে ধর্মীয় রঙ থাকায় তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে নি। জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেয়ার পথে স্থানীয়ভাবে জাত অন্তরায় এবং জাতীয় দলগুলোর উদাসীনতায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক ত বটেই, চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাদপদ থেকে যায়।

নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগে প্রয়াসী হন। নামের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক লেবেল অাঁটা ছিল বলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল কংগ্রেসের প্রতি। এবং ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবার প্রবল ইচ্ছাও। কিন্তু কংগ্রেস উপজাতিদের স্বার্থ দেখবে কিনা, তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে কিনা, এই ব্যাপারে উপজাতি নেতৃবৃন্দ স্বস্তি বা নিশ্চয়তা তখনও পান নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীণ নেতাদের অন্যতম কামিনী মোহন দেওয়ানের চিন্তা-চেতনায় এই আশঙ্কা পরিষ্কার পরিস্ফুট, 'এই সময় সারা ভারতব্যাপী কংগ্রেসের পতাকা তলে স্বরাজ্য আন্দোলন তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। ভদ্র ও শিক্ষিত লোকেরা অনেকে খদ্দর ভিন্ন বিলাতি কাপড় পরিধান করিয়া বেড়াইতে লজ্জা ও আশঙ্কা বোধ করিতে লাগিল। সভাসমিতি সকল সময় সর্বক্ষেত্রে হইতে লাগিল। বহু কংগ্রেস চরমপন্থী আমাকে সদলবলে ঐ শাখাতে যোগদানের জন্য চাপিয়া ধরিল। কংগ্রেসের বহু চরমপন্থী সময় সময় আমার বাড়ীতেও পদার্পণ করিতেছিল। আমি বলিতে লাগিলাম, আমার মতে এইরূপ আন্দোলন ও গুপ্তহত্যা, ধর্ম ও ন্যায়বিরুদ্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতরনে বরং প্রস্তুত হইতে পারি। বিশেষতঃ এই অশিক্ষিত নিরীহ পার্বত্যবাসীর পক্ষে ইহা কুফলপ্রসূ হইবে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এইখানে ইহার এখনও সময় আসে নাই। পরিশেষে আমি তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, তোমরা যদি আমাকে যুক্তিতে পরাস্ত করিতে পার, তবে আমি স্বাধীনতার জন্য তোমাদের দলে যোগ দিতে পারি বটে যদি তোমরা আমাকে আরও একটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পার। তাহা হইল এই— ভারত স্বাধীন হইল অর্থে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু ও মুসলমানেরাই স্বাধীন হইল বুঝিতে হইবে, কিন্তু সংখ্যালঘু অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালী বড়ুয়া প্রভৃতি

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আমাদের চাকমা জাতির বেলায় কি নীতি অবলম্বিত হইবে বলিয়া তোমরা মনে কর? তাহারা বলিল, স্বাধীনতা অর্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার লাভে সমর্থ হইবে। ইহাতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলিয়া থাকিবে না। আমি বলিলাম, ইহা শুনিতে এবং বইতে লিখিত বর্ণণা শ্রবণ করিতে শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে কতদূর কার্যকরী হয়, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

'আমি ইহাও বলিলাম, মনে কর তোমার পরিবারে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ বিভিন্ন বয়সের লোকই আছে। বাড়ীর কর্তা যদি শিশু ও যুবাকে সমান অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা করেন, তবে পক্ষপাত দোষ হইল না বটে, তবে তখন শিশুদের অবস্থা কি হইবে বলিয়া মনে হয়? মনে কর দৌড় প্রতিযোগিতায় বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলকে একসঙ্গে অংশ গ্রহণে বাধ্য করিলে ইহার পরিস্থিতি কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা হিন্দু-মুসলমান সভ্যতা গর্বে গর্বিত জাতির তুলনায় নাবালক শিশুমাত্র। আরও একটা বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হয় যে, একদিন আমরা স্বাধীন ছিলাম। এখনও প্রায় অর্দ্ধেক স্বায়ত্ব-শাসনের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছি। জাতীয় মোকর্দমাদি আমরা নিজেরা নিস্পত্তি করিয়া থাকি। স্বাধীনভাবে যে কোন স্থানে স্থানান্তরক্রমে বসবাস করিতে পারি। এইজন্য কোন জায়গা খরিদ বা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে হয় না। পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে কোন বনজ সম্পদ বিনা বাধায় ব্যবহার করিতে পারি—ইত্যাদি বহুবিধ সুবিধা, একই আইন বা নিয়মের অধীন থাকিতে হইলে ঐ সব সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া পাহাড়ীরা কদাপি আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। যেমন সভ্যজাতির সঙ্গে সংমিশ্রণে পৃথিবীর বহু উপজাতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ......তাহারা বলিল, নেতৃস্থানীয় লোক ভিন্ন ইহার বিষয়ে সঠিক উত্তর প্রদান সম্ভব নহে।

'বহু নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে স্বীকার করিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। অতএব, তোমরা যদি আমার সঙ্গে একজন লোক দাও আমি এই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য বোম্বে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি। তিনি ও সি. আর. দাশ মহোদয় এখন বোম্বে অবস্থান করিতেছেন। যদি একজন আমার সহিত যাওয়ার জন্য উপযুক্ত লোক পাই তবে আমি তাহার যাতায়াতের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিব। বোম্বে আসা—

যাওয়ার ব্যয়ভার বহনে আমাকে সম্মত দেখিয়া তখনই এক সদ্য এম. এ. ডিগ্রি প্রাপ্ত যুবক এই উদ্দেশ্যে আমার সহিত বোম্বে যাইতে রাজী হইল। চট্টগ্রাম হইতে তৎপরদিন আমি তাহাকে লইয়া রওনা হইলাম। বোম্বে পৌঁছিয়া গামদেবী রোড্ নামক রাস্তায় এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তাঁহার সহিত দেখা করতঃ উক্ত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি একটি উত্তরেই তৎক্ষণাৎ সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়মে জনগণ যেই প্রকার শাসন পদ্ধতি চাহে, তাহাই পাইবে।'[১] সেইবার কামিনী মোহন দেওয়ান সরোজিনী নাইডু ও সি. আর. দাশের সঙ্গেও বোম্বাইতে দেখা করেছিলেন। এরপর তিনি কখনও একা, কখনও বা স্নেহকুমার চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে, আবার কখনও স্নেহকুমার চাকমা একা দিল্লী গিয়েছিলেন। রাজা ভুবন মোহন রায় ও পরে রাজা নলিনাক্ষ রায়ও তাঁদের প্রতিনিধি অবনী রঞ্জন দেওয়ানকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম কার ভাগে পড়বে, এই জেলার জন্যই বা কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, জেলার অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্যই বা কতটুকু এবং কি ভাবে রক্ষিত হবে, তার কোন নিশ্চিত কাঠামো বা বক্তব্য দেওয়া দূরের কথা, প্রচ্ছন্ন যুক্তির আড়ালে এই এলাকার প্রতি তাঁদের অনাগ্রহ লুকানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলে তিন রাজা—মং, বোমাং ও চাকমা। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সার্কেলে বেশী জনসংখ্যা, শিক্ষিতের অপেক্ষাকৃত উচ্চ হার, তাঁর সার্কেলে জেলা সদর অবস্থিতি, তদুপরি নিজেও অপর দুই রাজার চাইতে শিক্ষিত হওয়ায় কারণে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। স্বাভাবিক কারণে চাকমা রাজা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত, বিশেষ করে চাকমা সার্কেল এবং তাঁর নিজের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিন সার্কেলের তিন রাজাই নিজের নিজের সার্কেল নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কোন সময় তা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। এক সার্কেলে আঘাত এলে অন্য সার্কেলও যে অক্ষত থাকবে না, এই ভাবনার অভাব ছিল প্রকট। অখণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থ অটুট

১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ:- ১৪৬-৪৮।

থাকলে তিন সার্কেলের রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে, এ বোধের অভাবে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐক্যবদ্ধ কোন প্রয়াস গড়ে উঠেনি। গুটিকয়েক নেতা, যাঁরা মনে করতেন তাঁরা জনগণের, তাঁদের মধ্যেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায় নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম না গড়ার দুর্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। ফলে, আশংকিত সংকট পার্বত্য চট্টগ্রামের গোটা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও সংকটমোচনের কম বেশী প্রচেষ্টা হয়েছিল রাঙামাটি কেন্দ্রিক, নয়ত বান্দরবনকেন্দ্রিক, অথবা মানিকছড়িকেন্দ্রিক। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তন্ত্রীতে অখণ্ড সুর বাজেনি কখনও। জাতীয় নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর উপর আলাপ-আলোচনার জন্য যে পার্বত্য নেতারা দিল্লী কিংবা ভারতের অন্যান্য শহরে গিয়েছিলেন, তাঁরা সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা এক হয়ে দিল্লী বা অন্য কোথাও যান নি কখনও। পৃথক পৃথক ভাবে যাওয়ার দরুণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর তাঁদের বক্তব্যে ভিন্নতা ছিল। ছিল সমাধানের রূপরেখার উপর ভিন্ন মত। দলগত কিংবা সকল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের অভাবে তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল অনুপস্থিত।

চাকমা সার্কেলে শিক্ষিতের হার বেশী হওয়ায় চিন্তা-চেতনার দিক থেকে অন্য দু'টির চাইতে এই সার্কেল বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল। স্বভাবতই রাজনৈতিক গুঞ্জন ও উদ্বিগ্নতা এই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ছিল বেশী। রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলও প্রথম এই সার্কেল থেকে। দেশ ভাগের আগে চাকমা সার্কেলে ছিলেন তিন ব্যক্তিত্ব। এক, রাজা ভুবন মোহন রায়, দুই, জনসমিতির সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান, তিন, জনসমিতির তরুণ সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা। তিন জনের চিন্তার ফারাক ছিল বিস্তর। সেই সময়ের পরিস্থিতি ও পরিবেশ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কামিনী মোহন দেওয়ান লিখেছেন, 'দ্বিতীয় জার্মান যুদ্ধ অবসানের পর, স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ বহুকাল পূর্ব হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য অবর্ননীয় কষ্ট, অপরিসীম ত্যাগ ও অকাতরে জীবন উৎসর্গের পরে ও যুদ্ধ অবসানেও আশান্বিত প্রতিশ্রুত ফল লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, তখন সমগ্র ভারতের বিক্ষুব্ধ জনতা নবউদ্যোগে তাড়িৎশক্তি প্রবাহতুল্য বিপুল প্রেরণার জীবন পথে পুনঃ উদ্বেলিত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার স্থির সংকল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করিতেছিল। তখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট জনতার অনমনীয় প্রেরণা অস্ত্রবলে গতিরোধ করার সম্ভাবনা

না দেখিয়া, তাহার চিরাচরিত নীতি ও স্বভাব মতে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির অঙ্গে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা ঘোষণা করিল। এই ঘোষণার বাণী শুনিয়া, এই পার্বত্য জাতিদের মনেও এক নতুন চিন্তা ও নতুন প্রেরণার ভাব জাগিয়া উঠিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া, স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সম্ভাবনা আছে কিনা তৎবিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্দ্ধারণ করার সময় উপস্থিত হইল। কাল প্রভাবে বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পর্যবসিত হইলেও এক সময় আমরাও স্বাধীন ছিলাম।......অতএব এই সুযোগে আমাদের পূর্ব গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কি প্রকারের স্বায়ত্বশাসন আমাদের উপযোগী হইবে—ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে তিন শ্রেণী লোকের আবির্ভাব দেখা দিল।

'চীফেরা চাহেন রাজতন্ত্র প্রথানুরূপ শাসন পদ্ধতি। জন সমিতির একপক্ষের লোক (স্নেহ কুমার চাকমার পক্ষীয়) চাহেন জনগণ কর্তৃক শাসন ক্ষমতার অধিকার লাভ। আমি এবং আমার দলীয় লোকেরা চাই, সমাজের নেতা কিংবা রাজা হিসেবে এই পদকে নির্বিঘ্ন ও স্থায়ী করার জন্য এমন এক শাসন নীতি প্রবর্তন আবশ্যক, যাহাতে চীফ বা রাজারূপে যিনি থাকিবেন, তিনি সকলের শিরোমণি গণ্য হইয়াও স্বীয় খেয়ালের বশে কিংবা স্বার্থসুবিধার খাতিরে ইচ্ছা করিলেও যেন প্রজার ক্ষতি ও উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার উপায় না থাকে।[১]

অবস্থা এমন জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, কেউ কারও মত থেকে একচুল নড়তে রাজি হন নি। মতানৈক্যের চরম অচলাবস্থার দরুণ দাবি আদায়ের মোটামুটি যে ভিতটুকু ছিল, তা নড়বড়ে হয়ে যায়। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা বাসা বাঁধে নেতা ও জনগণের মনে। ফলে, রাজা ভুবন মোহন রায় আরও বেশী রক্ষণশীল হয়ে যান এবং নিজের স্বার্থ যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি ভাবে আগলান যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত থাকেন। স্নেহ কুমার চাকমা আরও বেশি উগ্রপন্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান মধ্যপন্থা নিয়ে রাজা ভুবন মোহন রায় ও স্নেহ কুমার চাকমার মাঝে গড়ে ওঠা দেয়াল ভেঙে দিতে

১) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃঃ ২৪৯-৫০।

চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তারপর চেষ্টা করেন স্নেহ কুমার চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে চলার। এই প্রচেষ্টায়ও তিনি অসফল হন। তিন ব্যক্তিত্ব বা শক্তি যদি ন্যূনতম ভিত্তিতে এক থাকতেন, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্যার রূপরেখা হয়ত ভিন্ন হত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখতে উপমহাদেশ বিভক্তির আগে স্ব স্ব সার্কেলের জন্য দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা দাবি করেছিলেন বৃটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের তিন শক্তি তাঁদের দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না। পরবর্তীতে তাঁরা প্রস্তাব রেখেছিলেন, তিন সার্কেল, ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়া রাজ্যকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করতে। যা থাকবে কেন্দ্র শাসনাধীনে।[১] এক্ষেত্রেও রাজারা ব্যর্থ হন। রণকৌশলও তাঁরা বদলান। মং রাজা ও চাকমা রাজা, বিশেষত চাকমা রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশ শ ছেচল্লিশ সালে 'হিলম্যান এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ভুক্তির জন্য তদবির করা ও রাজাদের আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা।[২]

উনিশ শ ছেচল্লিশের শেষে কিংবা সাতচল্লিশের গোড়ার দিকে কংগ্রেসি এক কমিটি রাঙামাটি আসেন। কমিটির রাঙামাটি আসার উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য উপজাতিদের জন্য কি ধরণের শাসন প্রণালী উপযোগী, তা খতিয়ে দেখা এবং হাইকমাণ্ডের কাছে রিপোর্ট করা। সর্বভারতীয় এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এ. ভি. ঠক্‌কর। কমিটির সদস্যরা ছিলেন, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, জয়পাল সিংহ, রাজকৃষ্ণ বোস, ফুলবান সাহা ও জয়প্রকাশ নারায়ণ। কমিটিতে কো-অপ্ট মেম্বার ছিলেন স্নেহকুমার চাকমা। সর্বভারতীয় কমিটিকে উপজাতি প্রথায় প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। রাঙামাটি খেলার মাঠে জনসভা হয়েছিল। সেই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান।[৩]

১) অগ্গবংশ মহাথের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, কলকাতা, অকটোবর, ১৯৮১, পৃঃ ৩।

২) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃঃ ২৯২।

৩) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃঃ ২৫৪-৫৮

স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ ও সাদর অভ্যর্থনার উষ্ণতা পেয়ে কমিটির মেম্বারদের অভিভূত মন্তব্য, 'অনেকদিন যাবত বাতাস বদ্ধ বোতলের ছিপি খুলিয়া গেলে যেমন জোরের সহিত উহার বাতাস নির্গত হইয়া যায়, ইহাদের সেই অবস্থা হইয়াছে।[১]

আলাপ আলোচনার জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছিল রাঙামাটি সার্কিট হাউস। কমিটির সদস্যগণ রাজা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান, নীরোদ রঞ্জন দেওয়ান, ভুবন চন্দ্র চাকমা ও ঘনশ্যাম দেওয়ান।[২] কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দাবি-দাওয়ার অনেকাংশ মেনে নিয়েছিলেন। সেইভাবে হাইকমাণ্ডের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। রিপোর্টের কার্যকারিতা কতটুকু ছিল, তা জানা গিয়েছিল ভারত বিভক্তির পর যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩] ভারতের বিশেষ করে কংগ্রেসের কিছু নেতার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের প্রতি আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ভাগাভাগি রাজনীতির অন্ধ গলিতে সব সদিচ্ছা হারিয়ে গিয়েছিল।

ভারত বিভক্তিতে পূর্বাঞ্চলের কোন অংশ কার ভাগে যাবে, এমন সব বিতর্কিত বিষয়ের উপর তখন বেলবেড়িয়া হাউসে শুনানি চলছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে কংগ্রেসের দাবির চাইতে, পাকিস্তানে এই জেলা অন্তর্ভুক্তির জন্য মুসলিম লিগের দাবি এবং জিদ ছিল বেশি। মুসলিম লিগের পক্ষে যাঁরা ওকালতি করছিলেন, তাঁরা পার্বত্য উপজাতির বিশেষ করে সেই স্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, চাকমাদের মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেন।[৪] মোগল শাসনের সময় মোগলদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চাকমা রাজারা, কোন ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত প্রজারা মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহার করতেন। যদিও তাঁরা কোনদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন নি। চাকমা জাতির ইতিহাসে চম্মন খান, জালাল খান, শেরমস্ত খান, শের দৌলত পাগলা,

১) ঐ, পৃ: ২৫৩-৫৪।
২) ঐ, পৃ: ২৫৬।
৩) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী পৃঃ ২৫৬।
৪) সদ্রঞ্জ চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১৯৮৩।

টব্বর খান, জব্বর খান, ধরম বক্স খান প্রমুখ রাজাদের নাম ও কর্মবিবরণী পাওয়া যায়। মুসলিম নাম গ্রহণ করলেও তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[১] তা সত্ত্বেও নাম ও পদবী ব্যবহারের অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম লিগের উকিলরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যগরিষ্ঠ সম্প্রদায় চাকমাদের মুসলিম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[২] র‍্যাডক্লিপ এওয়ার্ড ঘোষিত হবার আগে পর্য্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা ভারত ভুক্তির জন্য কংগ্রেস নেতাদের দুয়ারে দৌড়াদৌড়ি করে সামান্য সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারেন নি। দায়ী প্রধানত কংগ্রেসী উদাসীনতা, অনেকের মতে কংগ্রেসী বেইমানি। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য নেতাদের অনৈক্য।

ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি ভাগাভাগির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ভাগে যাবে, সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ভুবন মোহন রায় নিজেকে গুটিয়ে নেন। এবং যা হয়, তাই মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান যদিও হাল ছাড়েন নি, তবু অনেকটা নিরুৎসাহ হন। কেউ কিছু করবে না যখন, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করতে হবে, এমন একটা পরিকল্পনা নেন জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা। তিনি গোপন সভা করলেন গ্রামে গ্রামে। পুলিশদের নিয়ে বিদ্রোহ করতে সচেষ্ট হলেন তিনি। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে দু' একজন অফিসার ছাড়া সব পুলিশ ছিল উপজাতি। সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েও ফেলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলবল নিয়ে ভারতীয় পতাকা তুলবেন। কামিনীমোহন দেওয়ান এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি যুক্তি দেন, হঠকারিতা করাটা অবিবেচকের কাজ হবে। উপজাতিদের ভাগ্য যদি নির্ধারণের ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে তা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের ভাগে পড়লে, তা মেনে নিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় সদ্য গঠিত কোন রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাতিকে 'জোর প্রকাশ পূর্বক' কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে সম্মত হতে পারে না। তিনি এই রকম হঠকারিতামূলক পদক্ষেপে মারাত্মক ফল ফলবে বলে প্রকাশ

---

১) বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য—বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, কালিশংকর দেওয়ান, রাঙামাটি, ১৯৬৯।

২) স্নেহকুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১৯৮৩।

করেন। স্নেহ কুমার চাকমার 'একগুঁয়েমী ও ভাবাবেগ প্রাপ্ত উন্মাদনা' রোধ করতে পারবেন না জেনে তিনি জনসমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।[১]

পূর্ব পরিকল্পনা মত, উনিশ শ সাতচল্লিশের পনের আগষ্ট স্নেহ কুমার চাকমা তাঁর দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে রাঙামাটিতে জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উড্ডীন থাকে বিশে আগষ্ট অবধি। জনসমিতি প্রতিরোধ বাহিনীও গঠন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর তুলনায় সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। একুশে আগষ্ট পাকিস্তানের বালুচ-রেজিমেণ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তোলে।[২]

অন্যদিকে বোমাং সার্কেলের জনসংখ্যার অধিকাংশ মারমা। মারমারা বৃহত্তম বর্মী জনগোষ্ঠীর অংশ। তারা বার্মার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিতে বোমাং সার্কেল, বিশেষ করে রাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। প্রতিবাদ ও বার্মার সঙ্গে একাত্ম ঘোষণার প্রতীক হিসেবে তাঁরা বান্দরবনে বার্মার পতাকা তোলেন। রাঙামাটির মত বান্দরবনেও পাকিস্তানী সৈন্যরা বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্নেহ কুমার চাকমা তাঁর দলবল নিয়ে দেশত্যাগী হন। বোমাং রাজপরিবারের কিছু সদস্য বার্মাতে আশ্রয় নেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিতে ক্রুদ্ধ হন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।[৩] রাজনৈতিক চাপে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিপ। হিন্দু-মুসলমান এলাকা চিহ্নিত করার জন্য তাঁকে দেয়া হয়েছিল দু'হাজার পাউণ্ড। সেই টাকা তিনি নেন নি। জানিয়েছিলেন নীরব প্রতিবাদ।[৪] আর যাদের নিয়ে এতকাণ্ড, যাদের অধিকাংশ

---

১) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃঃ ২৫৬-৫৭।

২) স্নেহকুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আগরতলা, ১৯৮২ ও অন একাউণ্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৪ জুলাই, ১৯৮২, পৃঃ ৩-৪।

৩) এ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউণ্টব্যাটেন, পৃঃ ১৩৯।

৪) এইচ. এন. পণ্ডিত, র‍্যাডক্লিপ সোড চাকমাস রীপ, অমৃত বাজার পত্রিকা. ১১মে, ১৯৮০।

জানে না, কেন এই দেশ বিভাগ, কেনই বা ভারত ও পাকিস্তান, পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই উপজাতি জনগণ পড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাড়ে শংকা। সতর্কতা আর-দূরত্ববোধ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আঠার শ ষাট সালে। চট্টগ্রামের পূর্বে পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলকে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করে এই জেলা গঠন করা হয়।[১] এই জেলা বিভিন্ন ভাষাভাষি বিভিন্ন ধর্মালম্বী সংখ্যালঘু তেরটি সম্প্রদায়ের বাসভূমি। ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চাকমা, তঙচঙ্গ্যা, চাক, খেয়াং, খুমি, ত্রিপুরা, মুরুং ম্রো, লুসাই, বোম, বনযোগী ও পানকো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলে আগমন ঘটেছিল। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সত্বেও গঠন ও প্রকৃতিতে অখণ্ডতা ও অভিন্নতা বজায় রেখে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল প্রতিটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও জীবনধারা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎস অর্থাৎ তারা কোন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, কখন কিভাবে তাদের চট্টগ্রাম ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পদার্পণ ঘটেছিল, এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শেকড় সন্ধানের উদ্দেশ্য বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন ভাষাগত ক্ষুদ্রজাতি সমূহের উৎস ভূমি, জনগোষ্ঠী ও বিবর্তন ধারা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাদের মতানৈক্য থাকলেও এটা সত্য যে, মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূত সম্প্রদায়ের মুখে মুখে অনেকটা এবং অংশত লিপিবদ্ধভাবে যে কাব্যিক ঘটনাপঞ্জী বিবৃত রয়েছে, তা ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে মূল্যবান। উপাখ্যানগুলো রোমান্টিক এবং বিভিন্ন সময়ে রাজা, রাজকুমার কিংবা যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ গাথায় পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। যুদ্ধগুলো ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের, কোনটি স্থল ও জলদস্যুদের তাড়াতে, কোনটি মগ, মোগল, পর্তুগীজ ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহ ক্রমে ক্রমে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। মোগলদের আসার আগে চট্টগ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চলে একক শক্তিশালী ও স্থায়ী কোন শক্তি ছিল না। সেই কারণে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের

---

১) রায়মোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯১৮, পৃঃ ২৭ ও হাচিনসন আর. এইচ. স্নিড, এ্যান এ্যাকাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, দি বেংগল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯০৬, পৃঃ ৪।

প্রশাসন নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করত। বৃহৎ বহিঃশক্তি সমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত তাদের হাতে সময় ছিল না বা তারা তা করত না। সতের শ সাতাত্তর সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল দখল করে। সতের শ সাতাশি সালে এক চুক্তি বলে এই অঞ্চল বৃটিশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।[১] আঠার শ ষাট সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ ভারতের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। অধিকন্তু বৃটিশ ভারত সরকার ৫,০৯৫ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে—চাকমা, বোমাং ও মং—ভাগ করে প্রতিটি সার্কেল একজন প্রধান বা রাজার নিয়ন্ত্রণে দেয়। তিনটি সার্কেল ৩৬৫ টি মৌজা নিয়ে গঠিত। প্রতিটি মৌজা দেখাশুনার করার জন্য একজন হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মৌজা গঠিত। প্রতিটি গ্রাম আবার একজন কার্বারীর প্রশাসনাধীনে দেওয়া হয়। প্রশাসনের সার্বিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসন বৃটিশদের হাতে যাবার আগে অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক; বিচার ও শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতা রাজাদের হাতে ছিল।[২] শাসনভার নিজেদের হাতে নিলেও বৃটিশরা রাজাদের কাজে বিশেষ একটা নাক গলাতো না। রাজাদের পদ মর্যাদাও অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। যদিও ক্যাপ্টেন টমাস, এইচ, লুইনসুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ মানা হয়নি। বরং বাংলার গভর্ণর কোন প্রকার তড়িঘড়ি পরিবর্তন না করার নির্দেশ দেন।[৩]

১) এ্যান একাউন্ট অফ্ চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, জনসংহতি সমিতি, ১৪ই জুলাই, ১৯৮২, পৃ: ২, অংগবংশ মহাথের স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃ: ২।

২) লে: কর্নেল টমাস্ এইচ্ লুইন, এ. ফ্লাই অন দি হুইল. কনস্টেবল এণ্ড কোং লিঃ লণ্ডন, ১৯১২, পৃঃ ২০৬-৭।

৩) সুগত চাকমা, চাকমা পরিচিতি, বরগাঙ পাবলিকেসন্স, অক্টোবর, ১৯৭৩, রাঙামাটি, পৃ: ১৪-১৫।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাদের না চটানোর প্রধান কারণ ছিল তুলা।[১] বৃটেনের বস্ত্র কারখানাগুলো চালু রাখতে প্রয়োজন ছিল কাঁচা মালের। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলার উৎপাদন ছিল সন্তোষজনক।

উপজাতিদের সামাজিক বিকাশে যাতে স্বকীয়তা বজায় থাকে এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপে উপজাতিরা হারিয়ে না যায়, তার রক্ষাকবচ হিসেবে বৃটিশ—ইণ্ডিয়া সরকার উনিশ শ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন্ রেগুলেটেড জেলার মর্যাদা দেয়।[২] এই রেগুলেসন বলে রাজাদের প্রভাব, মর্যাদা ও ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয়। এই রেগুলেসন জারী হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বহির্ভূত এলাকা (Excluded area) হিসেবে চিহ্নিত হয়। আঠার শ ষাট সাল থেকে শুরু করে উনিশ শ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন সম্পর্কিত যে সব নিয়মবিধি জারী হয়েছিল, তারই সুসংহত কাঠামো ও নীতিনির্ধারক হল উনিশ শ সালের রেগুলেসন। উনিশ শ সালের রেগুলেসন জারী হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ও প্রজাদের স্বস্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। উনিশ শ সালের রেগুলেসন প্রথম সংশোধন করা হয় উনিশ শ বিশ সালে এবং পরে উনিশ শ পঁচিশ সালে। উভয় সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে নতুন নীতি সংযোজিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃটিশ আমলে বাংলা কিংবা ভারতের আইন পরিষদে পাশ করা আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসিত হয় নি। হয়েছিল বাংলার গভর্ণরের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে প্রণীত রেগুলেসন অনুসারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগষ্ট পর্যন্ত উনিশ শ সালের রেগুলেসন অনুসারে শাসিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়ার পর সেই সংকটগুলোর একটি হল, যা ভারত উপমহাদেশ হাতছাড়া হবার সময়ে বৃটিশরা সমাধান করে নি বা সমাধানের রূপ রেখা দিয়ে যায় নি। সঁপে দিয়ে গিয়েছিল সদ্য জন্ম নেয়া ভারত ও পাকিস্তানের কাঁধে। স্বাভাবিকভাবে দুটি দেশের স্থিতিশীলতা,

১) এল. এস. এস. ও মেলেরী, ইস্টার্ণ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—চিটাগাং, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯০৮, পৃ:৩৮।

২। বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট নোটিফিকেসন নং ১২৩ পি. পি. ১লা মে, ১৯০০।

সামাজিক- আর্থ- রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও প্রগতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান। কারণ, স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান যাতে কমনওয়েলথে যোগ দেয়, এই অনুরোধ ছাড়া বৃটিশ সরকার দেশ ভাগের সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে সম্ভবত অন্য কোন অনুরোধ করেনি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের আসন্ন ভাগ্যবিড়ম্বনা নিয়ে আশঙ্কিত ছিল। ভারত ও পাকিস্তান, দুটি রাষ্ট্রই নিজেদের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে বৃটিশ সরকারের আইন-কানুন বহাল রেখেছিল। বৃটিশ পেনাল কোড ভারতীয় পেনাল কোড ও পাকিস্তান পেনাল কোডের নাম নিয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন ও এলাকার বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে, বৃটিশ সরকার যে সব নিয়মবিধি ও নীতি জারী করেছিল, সেগুলি পাকিস্তান সরকার কতটুকু রক্ষা করবে, তা নিয়ে উদ্বেগ ও সন্দেহের সীমা ছিল না। বিশেষ করে স্বাধীনতা লগ্নে এই জেলার দুইস্থানে বার্মা ও ভারতের পতাকা উড়ান হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান কি ধরণের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, তা অনুমান করে শংকিত ছিল পার্বত্য চট্ট-গ্রামের অমুসলিম জনগোষ্ঠী। মোগল সাম্রাজের পতনের পর ভারতের মুসলিম সমাজের মধ্যে যে শংকা, সতর্কতা ও দূরত্ববোধ জন্ম নিয়েছিল, অনেকটা অনুরূপ মানসিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের মনে। জনগোষ্ঠীর একটা অংশ এই মানসিকতার মারাত্মক শিকার হয়। তারা দেশ ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় বার্মা ও ভারতে। পাকিস্তানকে যারা মেনে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতায় হাত সম্প্রসারণ করে, তারাও সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত হতে পারেনি। পারেনি জনসাধারনের সামনে ভবিষ্যতের ছবি পরিষ্কার করে তুলে ধরতে। জাগাতে পারেনি জনসাধারনের মনে স্বস্তি, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধ। ফলে উপজাতি জনগনের অধিকাংশ নিজেদের গুটিয়ে নেয়।

স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি অস্থির হয়ে ওঠে। উনিশ শ চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত-'রাজ্যগুলো' (ষ্টেট স)' শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে শুরু হয় কেন্দ্র বনাম প্রদেশগুলির লড়াই। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন দেয়ার জোর দাবি ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো কি ধরনের হবে, কোনটি হবে রাষ্ট্রভাষা, তা নিয়ে চলে আলোচনা। বস্তুত দাবি পাল্টা-দাবির লড়াই অব্যাহত থাকে বহুদিন।

দেশের পূর্ব অংশকে বঞ্চিত ও শোষণ করার প্রবণতা পাকিস্তান সরকারের

প্রথম থেকেই ছিল। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে পশ্চিম অংশের নেতারা। তাঁরা এমন ভাব শুরু করেন যাতে মনে হয়, পাকিস্তান হাসিলের সংগ্রামে পূর্ব অংশের কোন অবদান নেই। তাঁরাই একক ভাবে লড়াই করে পাকিস্তান কায়েম করেছেন। পাকিস্তান হাসিলে পূর্ব বঙ্গের ত্যাগ ও অবদান ইতিহাস বিদিত। অথচ পাকিস্তান কায়েম হবার পর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। পশ্চিম অংশ, বিশেষ করে পাঞ্জাবী গোষ্ঠী তাদের শাসন শোষন বহাল রাখতে পাকিস্তানের জনগরিষ্ঠ অংশ পূর্ব-বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। বাংলা ভাষা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের ভাষা, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন শতাংশের মুখের ভাষা। কিন্তু তাদের মতামতের কোন মূল্য না দিয়েই রাষ্ট্রভাষা করা হয় উর্দুকে। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভীষণ। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মুখের উপর পূর্ব বাংলার জনগণ ছুঁড়ে দিয়েছিল তীব্র প্রতিবাদ, বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ :'না'।

ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের লড়াই। উনিশ শ আটচল্লিশ সালের 'না' পরবর্তীতে জন্ম দিয়েছিল অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন। যার ঢেউয়ের পর ঢেউ পাকিস্তানের বৈষম্য ও শোষণনীতির মূলে কঠোর আঘাত হেনেছিল। বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন তীব্রতর হয়। শহীদ হন ছাত্র জনতা। গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে চলছিল তখন ষড়যন্ত্র। কে কাকে তাড়িয়ে গদিতে বসবেন, তাই নিয়ে নেতারা মত্ত ছিলেন। আটচল্লিশের এগারই সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ অসুখে মারা যান। দুই বছর পর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম দুই স্থপতির আকস্মিক মৃত্যুতে পাকিস্তানে স্বার্থপরতার রাজনীতি দ্বিগুন প্রেরণায় জমে উঠে।

উনিশ শ চুয়ান্ন সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ আওয়ামি লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রন্টকে নির্বাচিত করে। মুসলিম লিগের হয় ভরাডুবি। আইন পরিষদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠী নির্বাচনে নিদারুন পরাজয় সহজ ভাবে নিতে পারেনি। যে কোন অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণের সরকারকে বাতিল করার মোক্ষম সময়ের

অপেক্ষায় থাকে তারা। সুযোগ এসেও গিয়েছিল। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেচ্ছা সফরে পশ্চিমবঙ্গে যান। কর্মজীবনের সোনালী দিনগুলো তাঁর কেটেছিল কলকাতায়। কলকাতায় এসে বহু পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাহচর্য পেয়ে তিনি ভীষণঅভিভূত হয়ে পড়েন। তেসরা মে নেতাজী ভবনে ভাষন দান কালে নেতাজী ও শরৎ বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি একজন পাকিস্তানী, এবং আমি একজন পাকিস্তানী হওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে কোন রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়নি, এমন ভেবে তাঁদের সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করার চেষ্টায় কোন দোষ দেখতে পাইনা।[১] ষোল আনা বাঙালী শেরে বাংলার এই মন্তব্যটি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এ মন্তব্য নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক বাংলার নির্বাচিত নেতাকে সরকারি মহল 'ভারতের পোষ্য দালাল' আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেনি। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, বগুরার মোহাম্মদ আলি শেরে বাংলাকে বলেছিলেন, আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক।[২]

সেই শুরু। এরপর থেকে পূর্ব বাংলার জনগন যখনই তাদের বাঁচার দাবি আদায়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছে, তখনই তাদের বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানের লেলিয়ে দেয়া কুকুর। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম উপজাতিদের বার্মাপন্থী বা ভারতপন্থী হিসেবে পাকিস্তান সরকার চিহ্নিত করবে, এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলার একটি জেলা। পূর্ব-বাংলার ভাগ্যের সঙ্গে তাই এই জেলার ভাগ্য জড়িত। তা সত্বেও পার্বত্য

১। মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৪৩-৪৪, অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, শংখ প্রকাশনী, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ: ৭৭-৭৮, মিলন দত্ত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারতরত্ন ইন্দিরা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আগষ্ট, ১৯৭০, পৃঃ ৩৩-৩৪।

২। আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ: ৩৪০।

চট্টগ্রামের সঙ্গে পূর্ববাংলার অন্য জেলার গুণগত কিছু পার্থক্য ছিল। পূর্ববাংলার অন্য অংশের জনগণের সমষ্টিগত না হোক, ব্যক্তিগত ভাগ্য গড়ার যে ন্যূনতম সুযোগ ছিল, তা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না। এটি সত্য সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরিবেশ ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ যে সামান্য পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, তা থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপ-জাতিরা ছিল বঞ্চিত।

নন-রেগুলেটেড জেলা হওয়ার দরুন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সীমিত এবং বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ। ধর্মীয় সভা করতেও পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হত। সম্ভবতঃ তিন রাজাও চাইতেন না, জনগণ রাজনীতি সচেতন হোক। তাঁরা হয়ত শঙ্কিত ছিলেন, জনগণ রাজনীতি সচেতন হলে, তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে না। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আগ্রহ দেখায় নি। আগ্রহ দেখালে পূর্ববাংলার স্বাধিকার অর্জন আন্দোলনে উপজাতিদের শরীক করা যেত। উপজাতিদের দেওয়া যেত নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আবার সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন কামিনীমোহন দেওয়ান। উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের উনিশে ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি নিয়ে গঠিত হয় 'হিল ট্র্যাকটস পিপলস্ অর্গানাই-জেসন।'[১] এটা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠন গড়ার তৃতীয় প্রচেষ্টা। 'জন-সমিতি' এবং 'হিলম্যান এসোসিয়েসন' পাকিস্তান সৃষ্টির পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় প্রচেষ্টাও বেশীদূর এগুতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এই সমিতিও টেঁকেনি।

উনিশ শ সালের রেগুলেসন পাকিস্তান সরকার বলবৎ রাখে। সেই অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। উনিশ শ সালের রেগুলেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য উপজাতিদের থেকে রিক্রুট করে একটি আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল। এই পুলিশ বাহিনীর আলাদা নিয়ম

১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ: ৩৬৬।

কানুন ছিল।[১] এতে জেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে উপজাতিদের অংশ-গ্রহণের একটা সুযোগ ছিল। বৃটিশ-ইণ্ডিয়া সরকার পার্বত্যবাসীর মনে নিরাপত্তার ও সহযোগিতার মনোভাব জাগানোর উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল। তা সুফলও দিয়েছিল। আটচল্লিশ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রনটিয়ার পুলিশ রেগুলেসন উঠিয়ে দেয়। বিলুপ্ত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ বাহিনী। উপজাতি জনগন ধরে নেয়, তাদের অধিকার খর্বিত হল।

বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন চালানোর সুবিধার্থে মাঝে মধ্যে রাজাদের পরামর্শের চাইত। রাজাদের পরামর্শের যথেষ্ট মর্যাদাও দেয়া হত। রাজাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ও জেল ছিল। উপজাতিদের গুরুতর অপরাধ, যেমন ধর্ষন, খুন, ডাকাতি ছাড়া লঘু অপরাধের সাজা রাজারা নির্ধারণ করতেন। রাজারা গুরুতর অপরাধের সাজা সুপারিশ করে অপরাধীকে জেলা সুপারিনটেনডেণ্টের আদালতে পাঠাতেন। জেলা সুপার সাধারণত রাজাদের সুপারিশের সম্মান রাখার চেষ্টা করতেন। গ্রাম ও মৌজার বিচার করতেন কার্বারী ও হেডম্যান। উপজাতি প্রথা অনুসারে বিচার বসত। সাজা হত উপজাতি কানুনে। রাজা প্রথার মত কার্বারী ও হেডম্যান প্রথা বংসানুক্রমিক নয়। রাজার ছেলে রাজা হয়। কিন্তু হেডম্যান বা কার্বারীর ছেলে হেডম্যান বা কার্বারী হবে, তার কোন নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা নেই। রাজা এবং জেলা সুপার ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে কাউকে হেডম্যান কিংবা কার্বারী মনোনীত করতে পারতেন। তবে বয়সজনিত কারণে বা দুরাচারের অভিযোগে সরে দাঁড়ানো হেডম্যান বা কার্বারীর, ঐ পদের যোগ্য, কোন সন্তান থাকলে, সে মনোনয়নের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেত।

উপজাতি জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল জুমচাষ (শিফটিং কালটিভেশন)। জুম অঞ্চলগুলো ব্যক্তি মালিকাধীন নয়, সম্প্রদায়গত। কার্বারী এবং হেডম্যানের অনুমতি নিয়ে যে কোন ব্যক্তি যে কোন অঞ্চলে জুম চাষ করতে পারে। বিনিময়ে প্রতিটি জুমচাষীকে খাজনা হিসাবে প্রতিবছর হেডম্যানকে—যিনি জুমকর সংগ্রহকারী-ছয় টাকা দিতে হয়। হেডম্যান ছয় টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা দেন তাঁর সার্কেলের রাজাকে। সোয়াএক টাকা সরকারকে। বাকীটা তাঁর প্রাপ্য।

১। চিটাগাং হিল ট্র্যাকস ফ্রনটিয়ার পুলিশ রেগুলেশন ।।। ১৮৮১, বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট সারকুলেসন, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১।

বছরের একটা দিনে হেডম্যানরা জুম কর স্ব স্ব রাজার কাছে পেশ করেন। জুম থেকে ফসল পাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে দিনটি নির্ধারিত হয়। দিনটিকে বলা হয় রাজার অধিষ্ঠান দিবস বা পুন্যাহ, উৎসব। সঙ্গে মেলারও আয়োজন করা হয়। মেলা চলে দু'তিন দিন ধরে। পাকিস্তান সরকার যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক লাভের স্বার্থে পুন্যাহ, অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু রাজাদের পরামর্শ বা মতামতের আমল না দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে। উপরন্তু রাজাদের অভ্যান্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এই ব্যাপারে বৃটিশদের ডিভাইড এণ্ড রুল নীতি পাকিস্তান সরকার প্রয়োগ করে। এক রাজাকে অন্য রাজার বিরুদ্ধে, এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিতে শুরু করে। এক রাজার আর এক রাজার প্রতি সন্দেহ এবং সংগঠিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে পাকিস্তান সরকারের কারসাজি রুখতে ঐক্যবদ্ধ কোন প্রচেষ্টা দানা বেঁধে ওঠেনি।

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় ছাপ্পান্ন সালে। এই শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ জেলার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। সারা পাকিস্তানে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হচ্ছিল। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে পর পর কয়েকটি সরকার গঠন ও পতন নিয়ে আসে অস্থির অবস্থা, ধোঁয়াটে ভবিষ্যত। সারাদেশে ক্রমবর্ধমান ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা আর অবিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ দেশের দুর্বলতম শ্রেনীভুক্ত। তাই দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়া তাদের জন্য ছিল আরও সংকটের ইঙ্গিত। আটান্নর তথাকথিত রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতায় এলেন মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মির্জা। পরে তাঁকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের গদিতে বসলেন। ছাপ্পান্ন সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়। নিষিদ্ধ হয় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। রাজনৈতিক দলগুলো হয় বেআইনি। সারাদেশে বয়ে যায় রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের বন্যা। হাজার হাজার ছাত্র যুবক গ্রেপ্তার হয়। কেড়ে নেওয়া হয় জনগনের মৌলিক অধিকার। অশুভ ঘটনার মিছিল ছায়া ফেলে পাকিস্তানের আকাশে।

পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় নীতি ছিল শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত করা। শিল্প বিপ্লবে শক্তি যোগাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দেয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর সেই কাজে জোর দেওয়া হয়। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, এটা ছিল

পূর্ব পরিকল্পিত। এটাও জানা ছিল, কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হলে রাঙামাটি মহকুমার বিস্তীর্ণ আবাদী সমতল জমি জলমগ্ন হবে। তা সত্ত্বেও পুনর্বাসন ব্যবস্থা যথাসময়ে শুরু করা হয়নি। যেমন উপজাতি জনগনকে বুঝানো হয়নি, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প দেশের অর্থনীতিতে কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মূল পেশা কৃষি। কৃষকেরা দুই শ্রেণীর। জুম চাষী ও সমতল ভূমির চাষী। ষাট সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। জলমগ্ন হয় শত শত একর আবাদী জমি। জুম চাষীরা জুম চাষ করলেও তাদের বসত বাড়ি ছিল সমতল ভূমিতে। ফলে হাজার হাজার লোক চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। সরকার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু পূর্ণবাসনের সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা নেয়নি। শুধু সমতল ভূমির চাষীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার তালিকায় রাখা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাম মাত্র। 'ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ'-এর এক প্রতিবেদনেও এই সত্যতার প্রমান মিলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার ক্ষতিপূরণের মাত্রা ধার্য করেছিল ৫৯ মিলিয়ন মার্কিণ ডলার। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয় মাত্র ২·৬ মিলিয়ন মার্কিণ ডলার। জুম চাষীরাও ছিল সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু তাদেরকে তালিকা বহির্ভূত রাখা হয়েছিল।

ক্ষতিপূরণের প্রকল্প নিয়ে দেয়া হল :…

এক, প্রকল্প এলাকা……২৫৩ বর্গমাইল

দুই, প্রকল্প সমাপ্তি……১৯৬০ সাল

তিন, পরিবার……১০, ৩৮৬ টি

চার, জনসংখ্যা……৯৯, ৯১১ জন

পাঁচ ক) ক্ষতিপূরণ প্রকল্প শুরু করার সাল—১৯৫৬

খ) শেষ করার তারিখ—৩১ শে মে, ১৯৬৮

গ) রাজস্ব বিভাগ আবাদী জমির ক্ষতিপূরণ বেঁধে দিয়েছিল নিম্নলিখিত হারে :…

এক, প্রথম শ্রেনীর জমি একর প্রতি-৬০০·০০ টাকা

দুই, দ্বিতীয় শ্রেনীর জমি একর প্রতি-৪০০·০০ টাকা

তিন, তৃতীয় শ্রেণীর জমি একর প্রতি-২০০·০০ টাকা

(ঘ) অর্থমঞ্জুর

এক, মূল প্রকল্প—

ক্ষতিপূরণ বাবদ—	৩, ৫৪, ০০, ০০০·০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবদ—	১১, ০০, ০০০·০০ টাকা
	৩, ৬৫, ৯০, ০০০·০০ টাকা
অতিরিক্ত প্রকল্প—	
ক্ষতিপূরণ বাবদ—	৬৯, ৮৭, ০০০·০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবাদ—	৩, ০৯, ০০০·০০ টাকা
	৭২, ৯৬, ০০০·০০ টাকা
সর্বমোট—	৪, ৩৭, ৯৬, ০০০·০০ টাকা

(ঙ) খরচ······

ক্ষতিপূরণ বাবদ······	৩, ৯৭, ১৮, ০০০,০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক বাবদ······	১৮, ১৫, ৬০০·০০ টাকা
	৪, ১৫, ৩৩, ৬৭২·০০ টাকা

(চ) উদ্বৃত্ত······

অর্থমঞ্জুর······	৪, ৩৭, ৯৬, ০০০·০০ টাকা
খরচ······	৪, ১৫, ৩৩, ৬৭২·০০ টাকা
	২২, ৬২, ৩২৮·০০ টাকা*

ক্ষতিপূরণ প্রকল্প থেকে এটা স্পষ্ট যে, ক্ষতিপূরণের হার ছিল নিতান্তই কম। জনসাধারণের পুরো হিসাবটাও এতে ধরা হয়নি। অধিকন্তু, অভাব ছিল বাস্তব পরিকল্পনার। ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া টাকা উপজাতিরা যাতে উৎপাদক মূলক খাতে ব্যয় করতে পারে, তার কোন সুযোগ বা ব্যবস্থা সরকার করেনি। স্বচ্ছল উপজাতি শ্রেণীর জমি ছিল। কিন্তু কাঁচা টাকার সঞ্চয় ছিল না। সঞ্চয় করার অভ্যাসও নেই উপজাতিদের। শস্য, ধান এবং ফল বিক্রি করে সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ তারা মেটাত। কাজেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া টাকা প্রকৃত ক্ষতির চাইতে অনেক কম হলেও উপজাতিদের ক্ষেত্রে তা হঠাৎ অনেক টাকা পাওয়ার

* জনসংহতি সমিতি, এ্যান একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১১ই জুলাই, ১৯৮৩, পৃ. ৬-৭।

মত হয়। অনুৎপাদক মূলক কাজে ও ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে তাদের টাকা ফুরোতে সময় লাগে নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু টাউট, ফড়িয়া শ্রেণীর লোক। তারা ইন্সিওরেন্স, সঞ্চয় প্রকল্প, ব্যবসা, হঠাৎ বেশি টাকা পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে সরল উপজাতিদের টাকা লুটে নেয়। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত ছিল ক্ষতিপূরণ প্রকল্পে জড়িত অফিসারদের দুর্নীতি। তারা কলমের খোঁচায় তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করতে পারত। এবং উল্টোভাবে প্রথম শ্রেণীর জমিকে তৃতীয় শ্রেণীতে এবং খাস অনাবাদী জমি প্রথম শ্রেণীতে তালিকা ভুক্ত করে যে কাউকে তারা পাইয়ে দিত মোটা ক্ষতিপূরণ। বলা বাহুল্য এই সব খাস জমির পরিমাণ বেশি করে দেখানোর ক্ষমতা এদের গোপন কলমে ছিল। করিয়ে নেয়ার দাওয়াই ছিল এদের খুশী করা, ঘুষ দেয়া। কাসালাং, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালার উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমির বিনিময়ে জমি নেয়ারও একটি প্রকল্প ছিল। এখানেও ছিল অফিসারদের কারচুপি। একই জমি কয়েকজনকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত, যে অফিসারদের সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে পেরেছে, জমি সেই-ই পেয়েছে। পাহাড়ি জনসাধারণের মধ্যে যারা ধূর্ত তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। প্রকৃত পাওনার চাইতে বেশি টাকা ও বেশি জমি তারা পায়। সৌভাগ্যক্রমে ধূর্তলোকের সংখ্যা যে কোন সমাজে খুব কম। স্বাভাবিক কারণে, দুর্দশাগ্রস্ত হয় সৎ সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় উপজাতি ও অনুপজাতির মধ্যে বৈষম্য টানা হয়েছিল বলে বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ দেখা যায়।[১] তদুপরি বাঁধ নির্মাণের ফলে কয়েক শ একর আবাদী জমি জলমগ্ন হলে এই এলাকার উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন কতখানি বিপর্যস্ত হবে, তার প্রতিক্রিয়াই বা কি হবে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার জরীপও চালানো হয়নি বাঁধ নির্মাণ শুরু করার আগে।

১। ডেভিড শোফার, পপ্‌লেসন ডিজলোকেসন ইন দি চিটাগাং হিলস্, দি জিওগ্রাফিকাল রিভিউ, ভলুম এল ।।।, ১৯৬৩, পৃ: ৩৩৭-৩৬২, বিমল কে. পাল, দি কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যামঃ ইটস্ ইম্প্যাক্ট অন দি ট্রাইবেল পিপল অফ্ দি চিটাগাং হিল, মানিটাবা বিশ্ব বিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৮০।

কিন্তু যা করা উচিত ছিল আগে, তা করা হয়েছিল ঘটনার পর। বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার তিন বছর পর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কি উপায়ে সম্ভব, তার সমীক্ষা তৈরী করতে ও বাঁধ নির্মাণের ফলাফল উপজাতি সমাজ জীবনে কতখানি পড়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য পাকিস্তান সরকার কানাডার 'ফরেষ্টাল ইনকরপোরেটডকে দায়িত্ব দেয়। ব্যাপারটা হয়েছিল ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মত। তাসত্ত্বেও ফরেষ্টাল ইনকরপোরেটডের রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে,

'The tribal people had attained a reasonably satisfactory way of life adequately adjusted to the limitation imposed by the physical environment before the dam was built. After the dislocation a disastrous cycle of over cultivation had let to depletion of soil fertility, loss of forest corp, serious erosion and further pressure on the remaining land'.

একই পাহাড়ে ঘন ঘন জুম চাষ করার ফলে জুমের উৎপাদনী শক্তি হয়ে পড়েছিল নিম্নমুখী। (সাধারণত এক পাহাড় জুম চাষ করলে, পরের বছর কিংবা তার পরের বছরও সেই পাহাড় আবার চাষের উপযোগী হয়না)। তদুপরি সমতল ভূমির চাষীরাও পাহাড়ে গিয়ে আস্তানা গাড়ায় উপজাতিদের অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে। বাঁচার উপায় কি, তার কোন তাৎক্ষনিক উত্তর কারও জানা ছিল না। ক্ষতিপূরণের হিসেবে পাওয়া টাকা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সংকটের মোকাবিলায় হতাশ হয়ে এই সময় উপজাতি জনগণের একটা অংশ ভাগ্যের সন্ধানে অন্য দেশে আশ্রয় নেয়।

উপজাতিদের যাযাবর চরিত্র বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দেখা গেছে. সংকটের মুখোমুখি হলেই তারা স্থান বদল করেছে। বদল করেছে দেশ। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পূর্বপাকিস্তানের অর্থনীতিতে আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিছু কল কারখানা গড়ে ওঠে। কুটির শিল্প অনেকটা তেজি হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়া উপজাতি জনগণের বিরাট অংশ তখন মৃত্যুর দিন গুনছে। চেষ্টা করছে অন্তত আরও একটা দিন বাঁচার। নিজেরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দেশকে তারা কতদূর এগিয়ে দিল, তা ভাববার অবকাশ তখন তাদের কোথায়? যা ভাবা স্বাভাবিক, তাই ভাবল উপজাতি জনগণের এই অংশ। সরকার তাদের ধ্বংস করার জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করেছে, এই ধারণা থেকে তারা কখনও মুক্তি পাইনি। ক্ষমাও করতে পারেনি পাকিস্তান সরকারকে।

১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক আর. আই. চৌধুরীর নেতৃত্বে উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে একটি জনমত যাচাই কমিটি জরীপ কার্য্য চালায় পার্বত্য চট্টগ্রামে। কমিটির রিপোর্ট দেখা যায় যে, ৬৯ শতাংশ চাকমাদের ধারণা কাপ্তাই বাঁধ তাদের খাদ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ৮২ শতাংশ বলেছে তারা স্থানচ্যুত হয়েছে জলমগ্ন হবার কারণে। ৮৭ শতাংশ বলেছে নতুন বসত বাটি তৈরি করতে তারা ভীষণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। ৬৯ শতাংশ অভিযোগ করেছে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার ও সরকারি কর্মচারীদের কারচুপির। ৭৮ শতাংশের অভিযোগ, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে তাদের জন্য কোন চাকরীর সুযোগ ছিল না। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের আগে তারা অর্থনৈতিকভাবে ভাল ছিল, এই মতামত ৯৩ শতাংশের।[১] যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তখন জন্ম নিয়েছিল তা দিনে দিনে বেড়েছে। তা দূর করতে সরকার কোন প্রকার গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে জন্ম নিয়েছিল আরও জটিল সমস্যা। অধ্যাপক এম. কিউ. জামান এমন একটি সমস্যা বিশ্লেষণ করতে চেয়ে বলেছেন,

'Considering the tremendous disruption of tribal life resulting from the Kaptai Dam and great influx of plains Bengalee people into Chittagong Hill Tracts as settlers to work on the new projects and establish new business and industry, it is not surprising that the tribal people began to put up some resistance. The Govt. response to these resistance was increasingly repressive, instead of regarding the action of the tribal as a natural reaction to the invasion of their territory, the tendency seemed most often to be to see the resistance as a Communist inspired guerilla activity spilling over the border from neighbouring Burma and India........However, it must be pointed out that Govt. policy or perhaps lack of a restraining Govt. policy created conditions under which tribals would

১। চৌধুরী, আর, আই, ট্রাইবাল লীডারশীপ এ্যান্ড পলিটিক্যাল ইনটিগ্রেসন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯।

be susceptible to leadership from any one who might seem to take the plight seriously'.[১]

পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্রের যোগ্য নয়, এই অজুহাতে আইয়ুব খান উনষাট সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্র কায়েম হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নিজস্ব ঢঙে সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ছিল, তা ভেঙ্গে পড়ে। আইয়ুবের নতুন পদ্ধতি দখল করে সেই শূন্যস্থান। আইয়ুবের 'ওয়ান ম্যান সো ডেমক্র্যাসি' তথা বুনিয়াদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় দেশের সচেতন জনগোষ্ঠী। চাপা উত্তেজনা থাকলেও বুনিয়াদি গণতন্ত্র দেশে চালু হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ ছিল গণতন্ত্র। অথচ গণতন্ত্রের মূল আদর্শ কবর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি আইয়ুব খান। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের শত বৎসরের সামাজিক প্রথা ও প্রশাসনিক কাঠামো থাকল কি থাকল না, তা নিয়ে ভাববার সময় আইয়ুবের ছিল না। শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট তখন সারা দেশে।

বাষট্টিতে আইয়ুবের দরজীখানায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও 'বহির্ভূত এলাকা' শব্দটি তুলে দিয়ে সেখানে বসান হয় 'উপজাতীয় এলাকা'। মূলধারা ও নিয়মবিধি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাবোধ ছিল ক্ষণস্থায়ী। ছেষট্টিতে শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হয়। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংশোধনীও ছিল। শাসনতন্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ করা ছিল, পুরো কিংবা আংশিকভাবে কোন উপজাতি এলাকার বিশেষ ব্যবস্থা যদি বিলোপের প্রয়োজন হয়, তাহলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে উক্ত এলাকার জনসাধারণের মতামত নেবেন।[২] কিন্তু পবিত্র শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত বিধি মানার কোন প্রচেষ্টাই প্রেসিডেন্টের মধ্যে দেখা যায় নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্গে কোন প্রকার মতামত বিনিময় না

১। এম, কিউ, জামান, ট্রাইবাল ইস্যুস এ্যান্ড ন্যাশনাল ইনটিগ্রেসন: দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস কেস, এম, এস, কোরাইসী সম্পাদিত, ট্রাইবাল কালচারস ইন বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তকের একটি প্রবন্ধ, পৃ: ৩১৪-৩১৫।

২। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২।

করে উপজাতি এলাকা হিসেবে জেলার বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দেবার বিল জাতীয় পরিষদে পাশ হয়ে যায়। উপজাতি জনগণ তাদের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবিত হয় আরেকবার। আবার পড়ে দেশ ত্যাগের হিড়িক। কয়েক হাজার উপজাতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা ও ভারতে আশ্রয় নেয়। উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিতে বার্মা ও ভারত পাকিস্তানের কাছে অনুরোধ রাখে। আন্তর্জাতিক চাপ এড়ানোর জন্য পাকিস্তান সরকার উনিশ শ সালের রেগুলেসন বলবৎ রাখে। কিন্তু বিশেষ জেলার মর্যাদা তুলে দেবার পর এই রেগুলেসন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যনীতি দুই প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জন্ম দেয় মানসিক দূরত্বের। দুটি প্রদেশের ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়ে বেশি ছিল সেই মানসিক দূরত্ব। পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ যত তীব্রতর হয়, তত পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম ও জনপ্রিয়তম সংগঠন আওয়ামি লিগ এক ইউনিট কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেবার দাবি জানায়। স্বায়ত্বশাসনের কাঠামো কি ভিত্তিতে হবে, তার একটি ফর্মুলা দেয় আওয়ামি লিগ। যা ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি হিসেবে খ্যাতি পায়। ছয় দফা দাবির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। সারা প্রদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উপ-মহাদেশ বিভক্তির প্রাক্‌কালে কংগ্রেস যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের টানার চেষ্টা করেনি, তেমনি আওয়ামি লিগ পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রমিক এলাকা চন্দ্রঘোনা ছাড়া কোথাও সংগঠনের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে দিতে মনযোগী হয়নি। ধর্মীয় লেবাস নিয়ে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের। সেই ধর্মীয় রাজনীতির কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছিল আওয়ামি লিগ। প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনীতি। ঘোষণা করেছিল প্রত্যেক ভাষাভাষি নিপীড়িত মানুষের জয়গান। অথচ দেশের একটা জেলার উপজাতিদের ভিন্ন ধরনের সংকট আওয়ামি লিগও সম্ভবত বুঝতে ব্যর্থ হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল-গুলোও উপজাতিদের জাতীয় মূল আন্দোলনে টানার প্রচেষ্টা নেয়নি। তাই সারা প্রদেশ আন্দোলনে আন্দোলনে টগবগ করলেও চট্টগ্রাম থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সঞ্চালিত হয়নি আন্দোলনের উত্তাপ।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পঞ্চাশ হাজার একর আবাদী জমি জলমগ্ন

হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অর্থনীতিতে এটা ছিল বিরাট আঘাত। জমি হারানোর পর দেখা দেয় নতুনভাবে বাঁচার তাগিদ। উপজাতি জনগণের একটা অংশকে খুঁজতে হয় জীবীকার নতুন অবলম্বন। অরণ্যাবৃত পাহাড়ে গড়ে উঠে জনপদ। জনপদগুলো ঘিরে গড়ে উঠে ফলের বাগান। অন্যদিকে, স্কুলে কলেজে ছেলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পায় কয়েক গুণ। শিক্ষার প্রসার বাড়ে। বাড়ে চেতনা। উন্মেষ ঘটে নতুন ভাবনার। কাপ্তাই বাঁধের ফলে একটি অঞ্চলের উপজাতিদের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। এবং এটাও সমান সত্য; কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী চাকমা সম্প্রদায়ের জীবনে এনেছে আমুল পরিবর্তন। বস্তুত, সূচনা করেছিল নবযুগের। ষাট থেকে সত্তর, এই এক দশক পার্বত্য চট্টগ্রামে রেঁনেসার হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের রেঁনেসার হাওয়াকে করে আরও সজীব ও সতেজ। উনসত্তরে আইয়ুব খান পালন করেন উন্নয়নের দশক বা ক্ষমতায় থাকার দশবছর পূর্তি উৎসব। আইয়ুবের উন্নয়ন দশককে ছাত্র সমাজ অভিহিত করেন অবক্ষয়ের দশক হিসেবে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সুসংহত ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী ছাত্র সমাজ একটি কর্মসূচী বা এগার দফা দাবি প্রণয়ন করেন।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানেই প্রথম দানা বেঁধে উঠেছিল। উনসত্তরে এই আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়ে। গণতন্ত্র ও প্রদেশ-সমূহের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে সারা পাকিস্তানে এক অভিন্ন সুর বেজে উঠে। প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের স্রোত পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রবেশ করে। উপজাতি ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগার দফা আন্দোলনের শরিক হয়। এই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়। সুযোগ এসেছিল এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উপজাতিদের জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে মেলানোর। সুযোগ পরেও এসেছিল। কিন্তু জাতীয় নেতারা সম্ভবতঃ উপজাতি সমস্যা সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন নি। তাই পারেন নি উপজাতিদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে তাদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে মেলাতে।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের তোড়ে আইয়ুব গদি ছাড়তে বাধ্য হলে জেনারেল ইয়হিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইয়াহিয়া সত্তরে সাধারণ নির্বাচন ঘোষনা করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশ মেতে উঠে। নির্বাচন শেষ মূহুর্তে আদৌ হবে কিনা, এ আশংকা থাকলেও শেষ অবধি নির্বাচন হয়।

যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ দুটি ছাড়া জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সব আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপল্‌স্ পার্টি অধিকাংশ আসন দখল করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন নির্ধারিত করা হয়েছিল। তাই জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা ছিল বেশী। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে স্বভাবতই আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কথা। পাকিস্তানে তখন তিন শক্তি। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগ। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্‌স্ পার্টি। আর পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী।[১] নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, সামরিক বাহিনী সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, এটা জানা ছিল। আওয়ামি লিগকে সরকার গঠনে আহ্বান জানাতে ইয়াহিয়ার চাইতে বেশি আপত্তি ছিল ভুট্টোর। ভুট্টোর ইন্ধনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ইয়াহিয়া প্রথম টালবাহানা, পরে বেঁকে বসেন। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল না। জনগণের ব্যালটের রায়কে বুলেটে প্রতিহত করতে ইয়াহিয়া রাস্তায় নামায় সেনাবাহিনী। জনগণ ক্ষমতা নয়, উহারা পায় গৃহযুদ্ধ। বন্দুকের নলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রুখতে গিয়ে পাকিস্তান ভাঙার পথ পরিষ্কার করে ইয়াহিয়া। দ্বি-জাতি তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটে পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ একাত্তর সাল।

একাত্তরের তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। দোসরা মার্চ ইয়াহিয়া সেই অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া আলোচনাসভা আহ্বান করেন। তারিখও ঠিক করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয় আওয়ামি লিগ, পিপল্‌স পার্টি ও অন্যান্য দলনেতাদের। বাংলায় তখন অসহযোগ আন্দোলন। একদিকে বৈঠক, অন্যদিকে চলছিল লড়াইয়ের প্রস্তুতি। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে সংগ্রাম কমিটি। অন্যদিকে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা দেশে 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠনের প্রস্তুতি চলছিল। পার্বত্য-চট্টগ্রামও এই প্রস্তুতির বাইরে ছিল না।

দেশের অন্যান্য অংশে আওয়ামি লিগের, বিশেষ করে এম, এন, এ, এবং

১। জুলফিকার আলি ভুট্টো, ইফ আই এ্যাম এ্যাসাসিনেটেড, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লি, ১৯৭৯, পৃঃ ১১৬।

এম, পি, এ,-দের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামি লিগ সংগঠন ছিল দুর্বল। কিন্তু সেই দুর্বলতা পূরণ করেছিল জেলার সরকারি প্রশাসন। কেন্দ্রীয় আওয়ামি লিগের নির্দেশে জেলা প্রশাসন উদ্যোগীর ভূমিকা নিয়েছিল। অনেক উপজাতি ছাত্র-যুবক অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দেয়। দেশের অন্যান্য জেলার মত পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রাথমিক ট্রেনিং শুরু হয় কাঠের রাইফেল দিয়ে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর কয়েকটি সত্যিকারের রাইফেল যোগাড় করা হয় প্রশিক্ষণের জন্য। কিন্তু উপজাতি ছাত্রদের অভিযোগ একমাত্র কাঠের রাইফেলই ছিল তাদের ভরসা। যে কোন কারণেই হোক তাদের হাতে সত্যিকারের রাইফেল তুলে দেওয়া হয়নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন জাতীয় রাজনৈতিক দল কিংবা দলের ছাত্র সংগঠন অথবা কৃষক শ্রমিক ফ্রন্টের (চন্দ্রঘোনা শ্রমিক এলাকা ছাড়া) ভিত বলতে কিছু ছিল না। সংগঠন ছিল নামে মাত্র। এই সব সংগঠন গুলোতে উপজাতি সদস্য ছিল না বললে চলে। পার্টি ভিত্তিতে যদি এই প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়, উপজাতিদের চোখে ব্যাপারটা দাঁড়ায় সেই একই, সচেতনভাবে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার এটা একটা কৌশল মাত্র। অথচ আসন্ন লড়াইটা ছিল গোটা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর। উপজাতি যুবকদের অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে জাতীয় সংকট মুহূর্তে ভেদাভেদ রেখা কেন টানা হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল অনুপস্থিত। ফলে, এই জেলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার স্তর তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ছিল। উপজাতিরা সরল এবং ভীষণ স্পর্শকাতর। একগুঁয়েমী তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণে বৈষম্যনীতি তাদের ভীষণ আহত করে। মুক্তি যুদ্ধে যে আগ্রহ তাদের ছিল, তা প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশে উবে যায় এবং নিরপেক্ষ থাকাটা তারা শ্রেয় মনে করে।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে অওয়ামি লিগ প্রার্থীরা যে দু'টি জাতীয় পরিষদ আসনে জিততে পারেননি, তার একটি হল ময়মনসিংহ, অন্যটি পার্বত্য চট্টগ্রাম। ময়মনসিংহ জেলার একটি আসনে মুসলিম লিগ প্রার্থী নরুল আমিন বিজয়ী হন। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় পরিষদের একমাত্র আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে চাকমা সার্কেলের রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন। দুটি আসনে পরাজয় আওয়ামী লিগের একশ্রেণীর নেতা সহজভাবে নিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

তাঁরা রাজা ত্রিদিব রায় ও নরুল আমিনের বিজয় একই চোখে দেখেন। রাজা ত্রিদিব রায় বরাবর নির্বাচনে লড়েছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। তিনি কখনও কোন পার্টির টিকিটে নির্বাচনে লড়েন নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য দুই রাজার তুলনায় রাজা ত্রিদিব রায়ের আলাদা একটা ভাবমূর্তি ছিল। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, অন্য দুই রাজা, রাজা ত্রিদিব রায়কে তাঁদের হয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। রাজা ত্রিদিব রায়ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ করে রাজাদের স্বার্থ সহজে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি কখনও। পূর্বসূরীদের তুলনায় তিনি ছিলেন কিছুটা প্রগতিশীল। এক সময় উপজাতি রাজার অধিকারের প্রশ্নে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তিনি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। মামলায় রাজা ত্রিদিব রায় জয়ী হন। এই ঘটনার পর পাকিস্তান সরকার তাঁকে ক্যাপ্টেন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। পরে তাঁকে মেজর উপাধিও দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজা ত্রিদিব রায়ের ভাবমূর্তি বেড়ে যায় আরও কয়েকগুণ। রাজাদের বহুযুগের তৈরী একটা কাঠামো ছিল। নির্বাচনের সময় এই কাঠামো রাজারা কাজে লাগাতেন।

বৃটিশ শাসনকাল থেকে তিন সার্কেলের তিন রাজাকে সময়ে সময়ে বেকায়দায় ফেলা হত। পাকিস্তানেও এই রেওয়াজ চালু থাকে। স্বাভাবিক কারণে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে তিন রাজার কোন না কোন ব্যাপারে মন কষাকষি ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজাদের প্রভাব কমে। বাড়ে প্রশাসকের ক্ষমতা। কাজেই বাড়ে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে সত্তর-একাত্তর সালে। তৎকালীন জেলা প্রশাসকের সঙ্গে রাজা ত্রিদিব রায়ের মিল ছিল না। ছিল অনেকটা রেষারেষি। ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাই আসন্ন মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের কোন কর্মকাণ্ডে রাজা ত্রিদিব রায়কে পাওয়া যায়নি। একেত্ত সব তৎপরতা নেওয়া হয়েছিল জেলা প্রশসেকের উদ্যোগে। উপরন্তু, আয়য়ামি লিগের নেতৃত্বে সারা দেশে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল। আওয়ামি লিগ রাজা ত্রিদিব রায়কে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে গড়া বিভিন্ন কমিটিতে জড়িয়ে পড়লে, তাঁর দল-নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি কতখানি বজায় থাকবে কিংবা আওয়ামি লিগ তাঁকে চোখে দেখবে, সে সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কারও নেতৃত্বে কাজ না করার মানসিকতা, যে কোন রাজার মত তাঁর মধ্যেও ছিল। জেলা প্রশাসকের আচরণও তাঁকে নির্লিপ্ত ও নিরুৎসাহ করে থাকতে পারে।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঠেকানোর উদ্দেশ্যে রাঙামাটির প্রবেশ পথ ঘাঘরা ও শিয়ালবুক্কাতে ডিফেন্স নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানী নৌ-সেনারা চট্টগ্রামের উপর গোলা বর্ষণ করছিল। রাঙামাটিতে তখন থমথমে অবস্থা। চট্টগ্রামের পতন হলে এবং ঘাঘরা ও শিয়ালবুক্কাতে নেওয়া ডিফেন্স ভেঙে গেলে যেন নিরাপদ কোন স্থানে চলে যেতে পারেন, তার জন্য রাজা ত্রিদিব রায় জেলা প্রশাসককে একটি জীপ ও স্পীড বোট পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। জেলা প্রশাসক তাঁর এই অনুরোধ রাখেন নি। বরং তাঁকে কোন খবর না দিয়ে জেলা প্রশাসক নিজেই নাকি রাঙামাটি ছেড়ে যান, এই অভিযোগ রাজ-পরিবারের।

এই সময় রাজা ত্রিদিব রায় আর একটি দুঃসংবাদ পান। তার কাকা কুমার কোকনাদক্ষ রায় ভারতের সীমান্ত পার হওয়ার সময় রামগড়ের তবল-ছড়িতে মুক্তি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। কুমার কোকনাদক্ষ রায় আওয়ামি লিগের মনোনয়ন নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে লড়েছিলেন। কিন্তু জিততে পারেন নি। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্যান্য অনেকের মত তিনিও ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার করার পর মুক্তি বাহিনী তাঁকে ভারতের জেলে পাঠিয়ে দেয়। পরে অবশ্য তিনি মুক্তি পান। গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ, তাঁর হাতে একটি সিভিল বন্দুক ছিল। রাজা ত্রিদিব রায় সন্দেহ করেন, তাঁর কাকার গ্রেপ্তারের পেছনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও জেলা আওয়ামি লিগের কারসাজি রয়েছে। এরপর বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে তিনি যোগাযোগের আর কোন চেষ্টা করেন নি।

চট্টগ্রামের পতনের পর হানাদার বাহিনী রাঙামাটির দিকে এগোয়। চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি আসেতে হয় আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে। রাস্তার দুপাশে স্থানে স্থানে জঙ্গল। চোরা-গোপ্তা আঘাত হানার উপযুক্ত পরিবেশ। হানাদার বাহিনী তাই ভীত ছিল। তারা রাঙামাটিতে দূত পাঠায়। তারা নিশ্চিত হতে চায় যে রাঙামাটির পথে কোন দুষ্কৃতকারী নেই এবং শহর পাকিস্তান সমর্থকদের দখলে। রাঙামাটির কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি এই নিশ্চয়তার খবর নিয়ে তাদের কাছে না যায়, তাহলে তারা বোমা মেরে রাঙামাটি শহর নিশ্চিহ্ন করে দেবে। রাঙামাটির মুসলিম লিগের পাণ্ডা তোফাজ্জল হোসেন এবং ঘটনাচক্রে রাঙামাটির দায়িত্বে থাকা ডেপুটি মেজিস্ট্রেট জনাব মোনায়েম উদ্দীন শহরের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে দেখা করে

তাঁকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন কিছু একটা করেন। রাজা ত্রিদিব রায় আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে হানাদার বাহিনী আনতে রাঙামাটির দ্বারপ্রান্তে যান। সেই থেকে রাজা ত্রিদিব রায় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

জাতীয় নেতারা রাজা ত্রিদিব রায়কে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে নিতে পারতেন। পারেননি অভাব ছিল দূরদর্শিতার। বিচক্ষণতার। রাজা ত্রিদিব রায়ও পারেন নি বাংলাদেশের অনিবার্য অভ্যুদয়ের কথা ভাবতে। পারেন নি উপজাতি জনগণের স্বার্থ তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের উর্ধ্বে স্থান দিতে। তিনি যদি তা পারতেন, তাহলে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে একটি সোনালী অধ্যায় সংযোজিত হত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাদেশিক পরিষদের দুটি আসন ছিল। সত্তরের নির্বাচনে দুটি আসনেই নির্দল প্রার্থী জয় লাভ করেন। একটিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, অপরটিতে অংশৈ চৌধুরী।

ষাট সালে আইয়ুব বিরোধী একটি লিফলেটের খসড়া তৈরী করার অভিযোগে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গ্রেপ্তার হন। তখন তিনি ছাত্র। তখনও রাজনীতিতে তাঁর অভিষেক হয়নি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি পুরোমাত্রায় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। তিনিই প্রথম উপজাতি ছাত্র, যিনি রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এতে তাঁর ভাবমূর্তি তৈরি হতে শুরু করে। সাধারণ উপজাতিদের বন্ধু ও প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পরিচিত হতে থাকেন। জেলের ভেতরে থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন জেল থেকে। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের তোড়ে সব রাজবন্দীই মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তিলাভ করেই লারমা পেয়ে যান তৈরী জমি। শিক্ষকতা করেন কয়েকদিন। উদ্দেশ্য হাতে পাওয়া জমি ভালভাবে চাষ করা। ষাট দশকেই গঠিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি লারমার পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সমিতি তখন লারমার রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম স্তম্ভ। তিনি এই সমিতিকে চাঙ্গা ও আরও সুসংগঠিত করেন। সত্তরের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হন। (তাঁর নির্বাচনি প্রতীক ছিল পিলসুজ। পরবর্তীতে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগঠনের প্রতীক হিসেবে নেওয়া হয়েছিল)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর এলাকায় রাজা ত্রিদিব রায়ের প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ। মানবেন্দ্র

নারায়ণ লারমা রাজতন্ত্র বিরোধী। তা সত্ত্বেও নির্বাচনি কৌশল হিসেবে রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে সমঝোতা করেন। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে রাজা ত্রিদিব রায়ের পক্ষে প্রচারে নামেন বিনিময়ে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে লারমকে সমর্থন করতে রাজা ত্রিদিব রায় তাঁর লোকজনদের নির্দেশ দেন। এই নির্বাচনি আঁতাতের ফলে রাজা ত্রিদিব রায় এবং মানবেন্দ্র লারমা, উভয়েই বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। একাত্তর সালে সারা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রক্তঝরা দিনগুলোতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উপজাতি জনগণের সামনে পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ হন। আসন্ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উপজাতিদের ভূমিকা কি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার কোন সঠিক উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময়ে তিনি হানাদার অধিকৃত এলাকায় ঘোরাফেরা করেছিলেন, কিন্তু হানাদারদের সঙ্গে তিনি কোন সহযোগিতা করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ বা অভিযোগ যেমন নেই, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে তিনি সহায়তা করেছেন, তারও কোন প্রমাণ ছিল না।

অংশৈ প্রু চৌধুরী ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। তাঁর এলাকায় রাজা ত্রিদিব রায়ের প্রভাব তেমন ছিল না। কিন্তু তাঁর পক্ষে একা নির্বাচনে জেতা ছিল কষ্টকর। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ নির্বাচনি এলাকায় বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরীর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষধর্মী। অংশৈ প্রু চৌধুরীর সঙ্গে বোমাং রাজা মাং শৈ প্রু চৌধুরীর ছিল সাপে নেউলে সম্পর্ক। তাই তিনিও নির্বাচনি আঁতাত গড়েন রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে। নির্বাচনি প্রতীক, রাজা ত্রিদিব রায়ের মত তিনিও নিয়েছিলেন হাতি।

অংশৈ প্রু চৌধুরী নিজেও বোমাং রাজ পরিবারের লোক। কিশোর কাল থেকে সমাজ কল্যাণমূলক নানা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। জন-প্রিয়তার দিক থেকে তিনি বোমাং রাজার বড় চ্যালেঞ্জ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি হতে পারতেন অন্যতম প্রধান নেতা। পাকিস্তানের অনিবার্য ভাঙন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অবশ্যম্ভাবিতা দেখেও তিনি ক্ষমতার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। একজন মন্ত্রী হিসেবে তিনি যোগ দিলেন অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তান সরকারে।

· জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রাজা ত্রিদিব রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামি

লিগের প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার আগে তিনি আওয়ামি লিগের সদস্য ছিলেন না। ব্যক্তি জীবনে ত্যাগী, নিঃস্বার্থ এবং প্রগতিশীল। রাজনীতিতে দীক্ষা তাঁর ছাত্রজীবনে। বামপন্থী রাজনীতিতে শিক্ষিত। দক্ষ বক্তা কিংবা সুসংগঠক তিনি নন। তবে ভবিষ্যত রাজনীতির ছবি আঁকতে পারেন ভাল। তিনি প্রথম উপজাতি নেতা, যিনি বলেছেন, বাংলাদেশ নামে একটি দেশের জন্ম অনিবার্য। উপজাতি ছাত্র যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি বহুবার বুঝিয়ে ছিলেন। দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে উপজাতি সমস্যার সমাধান চান তিনি। উপজাতিদের কি করনীয়, তা তিনি বারবার বলেছেন, নিজে কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করেন নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়টা মাস অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলের এক কোনে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন।

বোমাং সার্কেলের রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী পয়ষট্টিতে মুসলিম লিগের টিকিট নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন সেইবার। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানীদের অন্যতম বন্ধু হবেন। কিন্তু যতটা ভাবা গিয়েছিল, ততটা সক্রিয় তিনি হন নি।

রাজাদের মধ্যে একমাত্র মানিকছড়ির রাজা মং প্রু চাঁই চৌধুরী মুক্তি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই রাজার তুলনায় উপজাতি জনগণের উপর তাঁর প্রভাব তেমন ছিলনা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতাদের মধ্যে মং রাজা মং প্রু চাঁই চৌধুরী ও চারু বিকাশ চাকমা ছাড়া অন্য কেউ ইতিহাসের গতি প্রকৃতির অনিবার্যতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। উপলব্ধি করতে পারলে তাঁরা সম্মিলিতভাবে অবদান রাখতে পারতেন নতুন একটি দেশ সৃষ্টিতে। গড়তে পারতেন উপজাতিদের জন্য সুষ্ঠু, সুন্দর ও উজ্জলতর ভবিষ্যত।

সাতচল্লিশ আর একাত্তরের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। চব্বিশ বছরের ব্যবধানে শীর্ষ উপজাতি নেতাদের শিক্ষায়, চেতনায়, অভিজ্ঞতায় আসা উচিত ছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা আর একাত্তরের মৃতপ্রায় পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা কিংবা পাকিস্তানের যে অংশের সঙ্গে তাঁদের ভাগ্য জড়িত, সেই অংশকে নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের অনিবার্য অভ্যুদয় দেখেও নির্লিপ্ত থাকার মধ্যে ফারাক

যথেষ্ট। প্রথমটা ভাগাভাগির রাজনীতির বাধ্যবাধকতা, দ্বিতীয়টা ইতিহাসের পাঠ পড়তে না পারার ব্যর্থতা।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! উপজাতি নেতাদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদেরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর সেই ঘটনার চব্বিশ বছর পর কয়েকজন শীর্ষ উপজাতি নেতার চেষ্টার পরও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ড অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তার ভেতর থেকেই জন্ম নেয় একটি নতুন দেশ, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, এক নদী রক্ত পেরিয়ে উনিশ শ একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন—সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পাকিস্তানের পোড়া মাটি নীতি ও বর্বরতার বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল জনসাধারণের পুণর্বাসন, আহত মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা, গাঢাকা দেওয়া হানাদার দালালদের খুঁজে বার করা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র উদ্ধার ও শাসক দল আওয়ামি লিগের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাবিরোধী চক্র নিশ্চিহ্ন করা, যা স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ পেয়েছিল।[১] সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ঘরোয়া সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা তাদের বশংবদদের দিয়ে দেশের সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে নাশকতামূলক তৎপরতা শুরু করে। জাতীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়নে গৃহীত সব কর্মসূচী প্রতি পদে পদে বাধা পাচ্ছিল। বেশ কিছু কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারেনি। শত্রু ছিল আওয়ামি লিগের ভেতর এবং বাইরে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি জেলা। জেলার অধিবাসীদের সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয় বাংলাদেশের সার্বিক সমস্যা থেকে। বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতিদের সমস্যা ও সমাধানের রূপরেখা বিচার্য।

বৃটিশ সরকার চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণে আনার আগে এই এলাকার অধিবাসীরা বর্হিবিশ্ব সম্পর্কে ছিল অন্ধকারে, যেমন অজ্ঞ ছিল বর্হিবিশ্ব তাদের সম্পর্কে। ইংরেজরা এই এলাকায় জেলা সদর শহর প্রথমে চন্দ্রঘোনা ও পরে রাঙামাটিতে প্রতিষ্ঠা করে। নিয়ে আসে আধুনিক সভ্যতার উপকরণ স্কুল, রাস্তাঘাট, যানবাহন, টেলিফোন, হাসপাতাল এবং সংগঠিত প্রশাসন।

১। সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত, মিড নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা, কলকাতা, এ. এল খাতিব, হু কিলড্ মুজিব, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লী, জ্যোতি সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ ইন ব্লাড এ্যান্ড টিয়ারস, নয়া প্রকাশ, পরেশ সাহা, মুজিব হত্যার তদন্ত, কলকাতা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের চেতনার প্রসারে বৃটিশদের অবদান অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও, এটা সত্য, উপজাতিদের মনে বিচ্ছিন্নভাবে থাকার বা রাখার বীজ বুনেছিল বৃটিশরাই। যেমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে বৃটিশ শাসকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। বৃটিশ শাসনামলে এই জেলার অধিবাসীদের ভোটাধিকার ছিল না। বাংলার আইন পরিষদে গৃহীত কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোন নিয়মবিধি জারী ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হত বাংলার গভর্ণরের অফিস থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্ণরের আইন পরিষদের কাছে জবাবদিহি দিতে হত না। ফলে এই জেলার প্রশাসক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতেন। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এই বিশেষ ক্ষমতা জন্ম দিয়েছিল একজনের প্রশাসন ব্যবস্থা, পরবর্তীতে যা পাকিস্তান আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে আলাদা নিয়মবিধির যে প্রয়োজন, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই নিয়ম বিধিগুলো বৃটিশ শাসকদের খেয়ালখুশিতে আইন পরিষদে পাশ করা আইনে রূপান্তরিত হতে পারতনা। তেমনি, এই এলাকার জনগণের ভোটাধিকার দিলে এবং আইন পরিষদে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপন্ন হত কিভাবে, তা বোধগম্য নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা প্রথমবারের মত ভোটাধিকার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে লাভ করে। এই এলাকার পাহাড়ী জনগণের মনে বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালীদের সম্পর্কে ভীতি ও সন্দেহ, যা হয়ত এক সময় সুপ্ত ছিল, জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বৃটিশ শাসকেরাই সিংহভাগ দায়ী।

উপজাতিদের, বিশেষতঃ বৃহৎ চার সম্প্রদায়ের—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গা—লেখার অক্ষর আছে। আছে লিখিত অনেক লোকগাথা ও লোক কাহিনী। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে যেগুলো বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমী এই লুপ্তপ্রায় লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেয়। কিছু বই বাংলা একাডেমী ছেপে বের করে। কিন্তু প্রত্যাশিত গতি ও গুরুত্ব নিয়ে পরবর্তীতে কাজ এগোয় নি।

নিজেদের অবক্ষয়ের জন্য উপজাতিরাও সমভাবে দায়ী। নিজেদের বর্ণমালায় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা দেওয়ার মত কোন টোল তারা প্রতিষ্ঠা করেনি। বর্ণমালার চর্চাও তারা চালু রাখেনি। বাংলা ভাষার উন্নতিতে উইলিয়াম কেরির

অমূল্য অবদান রয়েছে। তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা না নিলে, বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন আরও বিলম্বিত হত। তেমনি আর এক ইংরেজ, রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার এইচ. এম. মিলার চেষ্টা করেছিলেন উপজাতিদের বাংলা বর্ণমালায় উপজাতি ভাষায় শিক্ষা দিতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি, প্রাথমিকভাবে চাকমা সম্প্রদায়ের জন্য 'চাকমা প্রাইমার' নামে বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় একটি শিশুপাঠ্য রচনা করে তা বিভিন্ন স্কুলে পড়ানোর জন্য চেষ্টা চালান। কামিনী মোহন দেওয়ান এই পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, বাংলা ও ইংরাজী ভাষা শেখা থেকে উপজাতিরা বঞ্চিত হলে বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পিছিয়ে পড়বে। মিলারের চেষ্টা সফল হয়নি। কামিনী মোহন দেওয়ান সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।[১] প্রশংসনীয় তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। তিনি যদি মিলারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করে সংশোধন করে দিতেন, তাহলে উপজাতিরা বাংলা ও ইংরেজীর সঙ্গে নিজেদের বর্ণমালা ও ভাষায় লেখা পড়া করার সুযোগ সরকারী বিদ্যালয়েই পেত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে উপজাতিদের জন্য চালু হয়ে যেত বাধ্যতামূলক উপজাতি ভাষা ও সাহিত্য কোর্স। উন্নতি হত উপজাতি সাহিত্যের।

পাকিস্তান ইসলামি করণের নামে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল লিঙ্গুয়াফ্রাংকা হিসাবে উর্দুর প্রাধান্য রেখে, উর্দু বাংলার মিশ্রণে একটা ভাষা চালু করতে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান উপজাতি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ সাধনে আগ্রহী হবে, ভাবাও ছিল অবান্তর। বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরোধিতা করা ছিল পাকিস্তানের অন্যতম মূল আদর্শ। অথচ দেশের পূর্বাংশ স্বাধীন না হওয়া অবধি ছিল বঞ্চিত, শোষিত। জনগণ ছিল নিপীড়িত। কাজেই এটা স্বাভাবিক ছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদাও পাবে না। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন হলে বা পাকিস্তানের ভেতর থেকেই আর একটি রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না হলে উপজাতিদের ভাগ্যে যে গুড়ে বালি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না, তা প্রমাণিত হয় আরও পরে।

১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, পৃঃ ২৩৪-৩৫।

সত্তরে বাঙালী জাতিয়তাবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। অনেক জাতীয় ও ছাত্রনেতা তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাঁরা বাংলার মুক্তির কথা বলেন। কিন্তু উপজাতিরা জাতিগত ভাবে (এথ্‌নিক্যালী) বাঙালী নয়, একথা তাঁরা বুঝাতে ব্যর্থ হন। বাঙালী জাতীয়তাবাদে উপজাতি স্বার্থ কি করে অক্ষুন্ন থাকবে, কি করেই বা বিভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহ বাঙালী জাতীয়তাবাদে শতফুলে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পাবে, তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি। ফলে সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি, ভুল বোঝাবুঝি। উপজাতিরা ভাবল, বাঙালী জাতীয়তাবাদ তাদের গিলে ফেলবে। তাদের আলাদা অস্তিত্ব আর থাকবে না। বস্তুত বাঙালী জাতীয়তাবাদে তারা উগ্র-জাতীয়তাবাদের অপছায়া দেখতে পায়। তাই তারাও নেয় পাল্টা ব্যবস্থা। সারা দেশে বয়ে যাওয়া বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ক্ষীণ হলেও একটি স্বতন্ত্র স্রোত—জাতিগত ভাবে আমরা বাঙালী নই—এই আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎসভূমি খুঁজে পায়। জাতীয় নেতারা যদি বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ও সঠিক বিশ্লেষণ উপজাতিদের সামনে রাখতে পারতেন, যদি তাঁরা বোঝাতে পারতেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদ দেশের জাতিগত ভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (National Minority)-কে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে, যদি তাঁরা গ্যারান্টি দিতে পারতেন যে বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদে উপজাতি সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথা অক্ষুন্ন থাকবে ও তা বিকশিত হবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা এড়ানো যেতে পারত।

মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের ঘটনার জের বজায় ছিল নয় মাসের যুদ্ধে। উপজাতিদের অভিযোগ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যে কোন উপজাতি তরুণকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। তাদের সন্দেহ, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও নাকি ছিল তাদের নিরুৎসাহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে অপমান করার। এই কারণে অনেক উপজাতি তরুণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু উপজাতি ছাত্র যুবক মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেকের কৃতিত্ব স্মরণীয়। মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার রণবিক্রম ত্রিপুরা ও অশোক মিত্র কার্বারীর বীরত্বের জন্য জাতীয় খেতাব পাওয়ার কথা ছিল। আঞ্চলিক কমাণ্ডার তাঁদের দুজনের নাম সুপারিশও করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাঁরা সেই সম্মান লাভে বঞ্চিত হন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যুবক কিংবা

জনগণের মানসিকতা ও প্রকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বিচার করলে ভুল হবে। সম্ভবতঃ অন্যান্য অঞ্চলের রিক্রুটের আগের কঠিন পরীক্ষা এই জেলায় প্রয়োগ করাকে উপজাতিরা ব্যাখ্যা করেছিল মুক্তিযোদ্ধা না করার ষড়যন্ত্র হিসেবে। দীর্ঘদিনের নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও জাতিগত বৈষম্যনীতির কারণে গড়ে ওঠা মানসিকতা এর জন্য দায়ী। তাদের আপন করার প্রক্রিয়াও হওয়া উচিত ছিল আলাদা। যেমনভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নাং, থো এবং মান্ জনগোষ্ঠীকে জড়ানো হয়েছিল। চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকা ছিল নাং, থো এবং মান্ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। এই তিনটি সম্প্রদায় জাতিগত ভাবে ভিয়েতনামী ছিল না। ভৌগোলিক কারণে তারা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসনও ভোগ করত। সম্প্রদায় তিনটি ভিয়েতনামীদের বরাবর সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখত। ভিয়েতনামী ভাষা তারা জানত না। জানলেও বলত না। অথচ নাং, থো এবং মান্ অধ্যুষিত পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে গিয়াপ ও তাঁর সাথীরা নাং, থো এবং মান্ ভাষা শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমমর্যাদার ভিত্তিতে মিললেন তাদের সঙ্গে। সব অসুবিধা একদিনে দূর হয়নি। অনবরত আন্তরিক চেষ্টার পর দেখা গেল ঘৃণা ও বিদ্বেষের স্থান দখল করে নিয়েছে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও ভালবাসা। ভিয়েতমীনদের প্রথম পর্যায়ের দিনগুলোতে নাং, থো এবং মান্ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় নেতাদের এই ধরণের অসুবিধা ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরটি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বাংলা বোঝে। বাংলায় কথা বলতেও পারে। তেরটি সম্প্রদায়ের ভাষা ভিন্ন। বাংলা ভাষা ছাড়া সব সম্প্রদায় বোঝে এবং বলতে পারে, এমন একটি সাধারণ ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। অধিকাংশ উপজাতির, প্রথমদিকে অসহযোগিতা মূলক মনোভাব ছিল না। ছিল না মুক্তি যুদ্ধে কাজে লাগানোর মত একাত্মবোধের অভাব। ২৫শে মার্চের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও অন্যান্য শহরের ডিফেন্স লাইনে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে পাঠানোর কাজে উপজাতি ছাত্র—যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে তা প্রমাণিত।

১। রাসেল স্টেলার, ভূমিকা, দি মিলিটারি আর্ট অফ পিপলস ওয়ার, জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপের নির্বাচিত প্রবন্ধ, মান্থলী রিভিউ প্রেস, ১৯৭০, নিউইয়র্ক ও লণ্ডন।

তা সত্ত্বেও তাদের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়ানো যায় নি। কারণ উপজাতিদের মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করা হয় নি। নেওয়া হয়নি বাস্তবোচিত পদক্ষেপ। তাই ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থান সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অরণ্যাঞ্চলের যে ভূমিকা হতে পারত, তা হয়নি।

রাজা ত্রিদিব রায় এবং অংশৈ প্রু চৌধুরী দখলদার বাহিনীর দুই সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। রাজা ত্রিদিব রায় মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে চলে যান। অংশৈ প্রু চৌধুরী জেলে বন্দী হন স্বাধীনতার পর। এই দুই জনের সব দোষ নিরীহ উপজাতিদের কাঁধে চাপে। যারা সাতেও ছিল না, পাঁচেও না, কেন যুদ্ধ, কার সঙ্গে কার যুদ্ধ যারা জানে না, তারাই হল স্বাধীন বাংলাদেশের দালালি আইনের শিকার।

একাত্তরের পাঁচই ডিসেম্বর উপজাতিদের জীবনে একটি কালো দিন। এই দিন নিরীহ উপজাতির রক্তে পানছড়ি এলাকা হয়েছিল রক্তাক্ত। সেই ক্ষত এখনও শুকোয়নি। বন্ধ হয়নি রক্তক্ষরণ। ঐ দিন পকিস্তানী হানাদার বাহিনী পানছড়ি এলাকা ছেড়ে দিলে অন্যতম প্রধান একটি জাতীয় দলের জেলা শাখার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তার নেতৃত্বে মুক্তি যোদ্ধা নামধারী একদল যুবক পানছড়িতে ঢুকে শুরু করে তাণ্ডব। ষোল জনকে গুলি করে ফেলা দেওয়া হয় জঙ্গলে। তার ভেতর ভাগ্যক্রমে দু'জন বেঁচে যায়। তারাই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী।[১] মুক্তিযোদ্ধা মনীশ দেওয়ান, অশোক মিত্র কার্বারী, প্রভুধন চৌধুরী এবং উগ্‌গ্য চাই চাইলেন চরম দুঃসময়ে উপজাতি ভাইদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়। তাঁরা পানছড়িতে প্রবেশ করতে পারেন নি। কর্তৃপক্ষের যথাসময়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বড় রকমের ভ্রাতৃসংঘর্ষ এড়ানো গেলেও এই ঘটনা উপজাতি ও অনুপজাতি মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। সেই শুরু। তারপর প্রতিদিন মারাত্মক ও ভয়াবহ খবর আসা শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামগুলো থেকে। উপজাতি বাড়ি লুট। উপজাতি খুন। উপজাতি মহিলা ধর্ষিতা।

রাজাকার সি. এ. এফ. আল্‌বদর, আল্‌শাম্‌স বাহিনীর কিছু পাণ্ডা

১। অগ্‌গবংশ মহাথের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্রাকটস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃঃ ৭। ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ২রা আগস্ট, ১৯৮০।

এবং সমতলের বিভিন্ন জেলা থেকে পালিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বিশে ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ সরকার এদের খুঁজে বার করতে নির্দেশ দেন। পুলিশ ও বি. ডি. আর. গভীর অরণ্যে ঢুকত না। ধারে কাছের জঙ্গলে অভিযান করে ফিরে যেত ক্যাম্পে। দালাল কিংবা রাজাকার, কাউকে তাঁরা খুঁজে বার করতে পারেনি। দালাল খুঁজে বার করতে না পারলেও দালালির অভিযোগে গ্রামবাসীদের ধরে এনে পুলিশ এবং বি. ডি. আর. নিপীড়ন শুরু করে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, জোর করে টাকা আদায় করা, পিটিয়ে ও গুলি করে মারা এবং নারী ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি বাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়। উপজাতি উপদেষ্টা মং রাজা মং প্রু চাই চৌধুরী উপজাতিদের উপর নির্বিচার অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। বরং অত্যাচার বেড়ে যায়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কয়েকজন অনুপজাতি যুবক বোমাং রাজার ভাই এম. এস. প্রু'র মাথা মুড়িয়ে, জুতার মালা পরিয়ে তাঁকে বান্দরবন শহরের পথে পথে ঘুরায়। রাজপরিবারের প্রতি এই নির্মম ব্যবহারে মারমা সম্প্রদায় বুঝে নেয় তাদের ভবিষ্যত কোন দিকে যাচ্ছে। বাহাত্তর সালের নয়ই জানুয়ারী বান্দরবন শহরে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী এবং অনেক মারমা নেতা উপস্থিত ছিলেন। সাতকানিয়া কলেজের জনৈক ছাত্র বোমাং রাজা এবং মারমা সম্প্রদায়কে আপত্তিকর ভাষায় গালাগালি করে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "বাঁচতে যদি চাও, তাহলে হয় বাঙালী হও, নয়ত বার্মায় চলে যাও।"[১] এই হুমকি মারমা সম্প্রদায়ের জাতিগত ভিন্ন অস্তিত্বে এবং মানসিকতায় তীব্র আঘাত হানে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র তখনও রচিত হয়নি। শাসনতন্ত্রের কাঠামো কি হবে, তাই নিয়ে চলছিল আলাপ-আলোচনা। বাহাত্তরে চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতি প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইন ও সংসদ

১। অগ্‌গবংশ মহাথের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১।

বিষয়ক মন্ত্রী এবং আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের দাবি জানান। একই সালের পনেরই ফেব্রুয়ারী গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে আর একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। সরকারের কাছে তাঁরা লিখিতভাবে চারটি দাবি পেশ করেন।

এক, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং তার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে। দুই, উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনাবিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে। তিন, উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে। চার, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পরে অবশ্য চার নম্বর দাবির সঙ্গে একটি সংযোজন যুক্ত করা হয় এই মর্মে যে, দেশের অজানা অঞ্চল হতে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপকহারে লোক এনে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢোকানো না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন।

প্রতিনিধি দলের পেশ করা স্মারকলিপির প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, পেশ করা দাবি মেনে নিলে জাতিগত অনুভূতি (এমনকি ফিলিংস) বৃদ্ধি পাবে। অখণ্ড জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র জাতির অস্তিত্ববোধ না থাকা বাঞ্ছনীয়। বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদে নিজেদের অস্তিত্ব বিকাশ সাধন করার পরামর্শ দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যে অর্থেই বলে থাকুন না কেন, তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। দাবী মেনে না নেয়ার চাইতেও প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হন তাঁদেরকে জাতিগত অস্তিত্ব বিলোপ করতে বলাতে। তাঁদের যুক্তি, মুসলিমদের আলাদা আবাস-ভূমি হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে তাঁরা মুসলিম হন নি। হয়েছিলেন পাকিস্তানি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক, কিন্তু বাঙালী নন।

তিয়াত্তরের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী সফরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাঙামাটি এসেছিলেন। তাঁর আগে পাকিস্তান সরকারের প্রধান হিসেবে জেনারেল আইয়ুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খাঁ রাঙামাটি এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাই

তাঁদের উপস্থিতি ঘিরে উপজাতি জনগণের প্রত্যাশা ছিল না। দেশের অবিসংবাদী নেতা, জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের রাঙামাটি আসা এবং উপজাতিদের সামনে বক্তব্য রাখার গুরুত্ব ছিল তাই অনেক বেশি। রাঙামাটি প্রদর্শনী ময়দানে বিরাট জনসভা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাঙামাটি আসা এই প্রথম এবং শেষ। আঞ্চলিক বৈষম্য এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকণ্ঠ ছিল সুপরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার বহু যুগ ধরে। তাই তারা ভাবল, তাদের ভাগ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে রাঙামাটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণায়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে উপজাতি জনগণ তাদের ভবিষ্যত কি, তা শুনতে চাইল। আগ্রহভাবে তারা দূর দূরান্ত থেকে এসে হাজির হয় জনসভায়। উপজাতিদের মনে জন্ম নেওয়া আশংকা দূর করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, উপজাতিদেব ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন ও কাঠামোগত বৈচিত্রে ও বৈশিষ্টে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। এতদিন তাদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সেইদিনের অবসান হয়েছে। উপজাতিরা দেশের যে কোন নাগরিকের সমান মর্যাদা পাবে। উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, উপজাতিদের প্রমোশন দিয়ে সেইদিন থেকে বাঙালী করা হল।[১] কিন্তু কোন অর্থে বাঙালী করা হল, তা তিনি খুলে বলেন নি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের পরিবর্তন আসে সাধারণতঃ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিকাশের একটা স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নিজস্ব ঢঙে, ভেতর থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আরোপ করার পথে নয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুসলিম লিগের যখন জন্ম হয়, তখনও দ্বিজাতি তত্ত্বের আবেশ জনগণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই আওয়ামি মুসলিম লিগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলিম শব্দটি বাদ দিলে তখন সেটি হত অতি র‍্যাডিক্যাল পদক্ষেপ। জনমনে সম্ভাব্য

১। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী প্রচার সভা, রাঙামাটি, ১৯৭৩।

প্রতিক্রিয়া এড়াতে জন্মলগ্নে যে বাধ্যবাধকতা ছিল, পাঁচ বছর পর তা আর থাকেনি। 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে নামে এবং কাজে করা হয় ধর্ম-নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সামাজিক অবস্থা ছিল অনুন্নত সামন্ততান্ত্রিক। রাজারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে শোষণ করতেন। তা সত্ত্বেও জনগণ রাজাদের কখনও শোষক ভাবতে পারেনি। ভাবত রক্ষক। শোষণের চেহারাটা তাদের কাছে প্রকট ছিল না। ছিল না তাদের চিন্তাচেতনার উন্নত ধারা। তাদের সামনে ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা। তাই উপজাতি জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা কাঠামো ভাঙতে তৈরি ছিল না। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়। কিন্তু উপজাতিদের সার্বিক অবস্থা তাই'ই রইল, যেমন ছিল পাকিস্তানের আমলে। উপজাতি বা ক্ষুদ্রজাতি সত্তার (ন্যাশনাল মাইনরিটি পরিচয় দিতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত উপজাতি জনগণ। সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে একদিন বিলুপ্ত হত। চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে অবলুপ্তির পথে এগুতো সামন্ততন্ত্র এবং তার প্রতি উপজাতি জনগণের দুর্বলতা। জোর করে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া জনমনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি তাদের নিজস্ব সত্ত্বাবোধ নিয়ে থাকতে চেয়েছিল, বাঙালী হিসেবে নয়। হঠাৎ বাঙালীত্বে প্রমোশন তারা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারেনি। বরং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাকে তারা ধরে নেয় জাতিগত অস্তিত্বের উপর চরম আঘাত হিসেবে। উনপঞ্চাশ সালে আওয়ামি লিগ জাতীয় রাজনীতিতে উল্লম্ফন এড়িয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছিল। কিন্তু সেই আওয়ামি লিগ তিয়াত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহের জন্য নীতি নির্ধারণে উল্লম্ফন দিয়ে ভুল করেছিল বলে মনে হয়।

ভুলের ফায়দা তোলে কয়েকটি তথাকথিত বিপ্লবী দল। জাতীয় রাজনীতিতে যাদের ভূমিকা ছিল না। ছিল না নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও স্পষ্ট বক্তব্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই দলগুলো রাতারাতি বের করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। এইসব পত্র-পত্রিকায় উপজাতিদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা বিস্তর লিখে উপজাতিদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। তথাকথিত বিপ্লবী দলগুলোর উদ্দেশ্য অবশ্য উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা ছিল না। দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং স্বাধীনতা বিপন্ন করাই ছিল তাদের

মূল উদ্দেশ্য। দলগুলোর পরবর্তী ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর পর্যায়ক্রমে আসা প্রতিটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের উপর নির্যাতন বাড়ায়। সারা দেশে এক আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য আইন। বলতে গেলে সেখানে আইনের শাসনই নেই। অথচ এক সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠা বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলো খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ, জিয়াউর রহমান, আবদুস সাত্তারের বৈরী উপজাতি নীতির বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

একমাত্র ব্যতিক্রম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ। চুয়াত্তরের সতের মার্চের আগে দলের বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, স্তর নিয়ে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল না। স্বভাবতই, শত্রু মিত্র নির্ধারণ ও আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারনা ছিল অনুপস্থিত।[১] জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাসদের ছিল 'অগোছাল' এলোপাতাড়ি, গোঁজামিল, দায়সারা গোছের কাজ এবং বক্তব্য।[২] পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও জাসদের ভূমিকা সম্পর্কে এই মূল্যায়ন প্রযোজ্য। তা সত্বেও, উপজাতি ইস্যুর উপর জাসদের ধারাবাহিক ভূমিকা রয়েছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্জক হল দেশের প্রগতিশীল দু'টি রাজনৈতিক সংগঠন। ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (মো:) বা ন্যাপ ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সি. পি. বি)-টির ভূমিকা। দীর্ঘদিনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি জনগণ এই দু'টি দলের ইতিবাচক সাড়া প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু তা পূরণে এবং উপজাতিদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল এই দু'টি দল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্যা নিয়ে ন্যাপের (মো:) ভূমিকা যে উজ্জল হতে পারত তা বলার কারণ, উপজাতিদের ওপর আবেদন ছিল বলেই ন্যাপের (মো:) এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখায় উপজাতি সদস্যসংখ্যা' তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জাতীয় ছাত্র সংগঠনের চাইতে বেশি ছিল। ছাত্র

১। জাসদের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২৯. ৩. ৮৪, পৃঃ ১৪।
২। সিরাজুল আলম খান, আন্দোলন ও সংগঠন প্রসঙ্গে, পৃঃ ৭।

ইউনিয়নের উপজাতি ছাত্রনেতাদের মধ্যে হিমাংশুবিকাশ খীসা, ম্যামা চিং লিলি, করুণেশ চাকমা, অশোক মিত্র কার্বারী, সুধাময় চাকমা ও ইলা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ন্যাপের (মোঃ) সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকলে আরও অনেক উপজাতি ছাত্রকে ছাত্র ইউনিয়নের পতাকাতলে সমবেত করা যেত এবং পরবর্তীতে ন্যাপেও উপজাতি সমস্যা সংখ্যা বাড়ানো যেত। ন্যাপের (মোঃ) উদ্যোগে স্বাধীনতার পর রাঙামাটিতে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা। সংগঠনগত শক্তির অভাব এবং স্বল্প প্রচার সত্ত্বেও সভায় জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। সভার মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। ফলে উপজাতি জনগণ যেমন নিরাশ হয় নি, তেমনি আশার আলোও দেখে নি। ন্যাপের (মোঃ) সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নীতি থাকলে সারা বাংলাদেশে যেমন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত, তেমনি পেত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সংগঠিত করার সুযোগ। তাহলে হয়ত, জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে উপজাতিদের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারত।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ময়মনসিংহের গারো, হাজং অধ্যুষিত অঞ্চলে এক সময় গড়ে উঠেছিল টংক এবং তেভাগা আন্দোলন। গারো ও হাজংদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মিল রয়েছে অনেক। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেই রকম কোন আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে না উঠলেও পঞ্চাশ দশকে এই এলাকার প্রথম উপজাতি কমিউনিষ্ট মোহনলাল চাকমার নেতৃত্বে রাঙামাটিতে একটি শিক্ষক আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলন সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে মোহনলাল চাকমার উপর জারি হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের বিশেষ ক্ষমতার একান্ন নম্বর ধারা। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম। (পরে তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভার সদস্য হয়েছিলেন।) এরপর কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে বা কোন কমিউনিষ্টের নেতৃত্বে কোন আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে হয়নি। সি. পি. বি উদ্যোগ নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বোঝানোর রাস্তা সহজ হত যে, সারা দেশের সার্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির উন্নতি। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার

সংগ্রামে সি. পি. বি-ও অকৃত্রিম বন্ধু, তা বোঝাতে সি. পি. বি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ একই সাথে শ্রেণী সহাবস্থান ও শ্রেণীসংগ্রাম তথা গঠনমূলক বিরোধিতার নামে দলটি আওয়ামি লিগ সরকারের সহযোগী হয়ে ওঠে। অন্তত জনগণ সেই দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে। ন্যাপের (মোঃ) বেলায়ও একই কথা বলা চলে।

স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠনের শেকড় ছড়াতে মনোযোগী হয়। স্বাধীনতার আগে আওয়ামি লিগে উপজাতি সদস্য ছিল না বললেই চলে। তবে আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগের কিছু উপজাতি সদস্য ছিল। তন্মধ্যে গৌতম দেওয়ান, মনীষ দেওয়ান, মনি স্বপন দেওয়ান, সুশোভন দেওয়ান ও প্রাণতোষ চাকমার নাম উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর ছাত্র লিগ দু'ভাগ হলে তাদের অধিকাংশ রব-শাজাহান সিরাজের দলে চলে গিয়েছিল। দলের পতাকাতলে উপজাতিদের টানার কৌশল হিসেবে আওয়ামি লিগ সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দুই উপজাতি প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। নির্বাচনের পর থেকে চারু বিকাশ চাকমা আওয়ামি লিগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কুমার কোবনাদক্ষ রায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কোন কাজে সক্রিয় থাকেন নি। স্বাধীনতার পর চারু বিকাশ চাকমার প্রভাবে উপজাতি অনেক নেতা আওয়ামি লিগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক তখন ছিলেন সাইদুর রহমান। আওয়ামি লিগের জন্য প্রচুর ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি একাই ছিলেন সংগঠনের কর্মী এবং নেতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাইদুর রহমানকে সামনে রেখে স্বাধীনতাত্তোর পরিবেশের কায়দা তুলতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী আওয়ামি লিগে অনুপ্রবেশ করে।

বাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা তদারকির জন্য একটি কমিটি নির্বাচন করার প্রথা ছিল। বাজার বা বাজারের কাছে গ্রামগুলো থেকে সবার গ্রহণযোগ্য কাউকে বাজার প্রধান বা বাজার চৌধুরী নির্বাচন করা হত। বাজার চৌধুরী উপজাতি বা অনুপজাতি, যে কেউ হতে পারতেন। আগেই বলা হয়েছে মৌজা ও গ্রামগুলোর বিচারক ছিলেন হেডম্যান এবং কার্বারীরা। তাঁদের বিচারের রায় অনুপজাতিরাও মেনে নিত। এতে দুই সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় ছিল। স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগে অনুপ্রবেশকারী এক

শ্রেণীর লোক এতদিনকার প্রচলিত প্রথা জোর করে তুলে দিতে চাইল। শুধু গ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নয়, হেডম্যান-কার্বারীদের বিচার করাও তারা শুরু করে। কেবলমাত্র উপজাতিরা এতে আহত হয় নি। অনেক বছর ধরে বসবাস করা অনুপজাতিরাও এই তুঘলকি কর্মকাণ্ড সমর্থন করতে পারেনি।

সাইফুর রহমানের নাম ভাঙ্গিয়ে এক শ্রেণীর লোকের দুষ্কর্ম উপজাতিদের জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। উপজাতি জনগণ মনে করল, যেহেতু সাইফুর রহমান জেলা আওয়ামি লিগের নেতা, সে জন্য সব দুষ্কর্মের নেপথ্যে আওয়ামি লিগের ইন্ধন রয়েছে। উপজাতিদের এই ধারণা সর্বৈবভাবে সত্য নয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট করতে তখন দেশের বিশেষ একটা স্বার্থান্বেষী চক্র উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা দেশের সর্বত্র উস্কানিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের নানা অংশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল বাঙালীদের মধ্যে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা বিরোধ বাঁধিয়ে দিচ্ছিল উপজাতিদের সঙ্গে অনুপজাতিদের।

চারু বিকাশ চাকমা জেলা আওয়ামি লিগ ঢেলে সাজানোর অনুরোধ কেন্দ্রীয় আওয়ামি লিগের কাছে রাখছিলেন অনেকদিন ধরে। বাহাত্তরের শেষের দিকে নাম মাত্র পুরানো কমিটির কার্যকলাপ এবং নতুন কমিটি গঠন খতিয়ে দেখতে আওয়ামি লিগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক ও প্রচার সম্পাদক সরদার আমজাদ হোসেন রাঙামাটি এসেছিলেন। রাঙামাটির কোর্ট প্রাঙ্গণে তাঁরা এক জনসভায় বক্তৃতাও করেন। সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে আসা। এর কিছুদিন পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামি লিগের নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমি[illegible] সভাপতি হন চারু বিকাশ চাকমা এবং সাধারণ সম্পাদক জেড. এ. আলম। [illegible] কজন উপজাতি নেতাকে জেলা কমিটিতে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যাশা মত জে[illegible] আওয়ামি লিগ সংগঠনের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিতে পারেনি জেলার সর্বত্র। তেমনি উপজাতিদের ওপরও তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

শাসক দল আওয়ামি লিগের উপজাতি জনগণের মন জয় করে সাংগঠনিক শেকড় ছড়ানোর সুযোগ ছিল দ্বিবিধ। সুষ্ঠু উপজাতি নীতি ঘোষণা এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ণ।

উপজাতি ও অনুপজাতি, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ববোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির বিশেষত্ব—যা জাতীয় দলগুলোর পক্ষে এই জেলায় সংগঠন করার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। একদিকে জাতীয় দলগুলোর প্রতি উপজাতিদের অবিশ্বাস, অন্যদিকে জাতীয় দলগুলোর প্রায় অনস্তিত্ব শাখা এবং ত্রুটিপূর্ণ কর্মকাণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে জাতীয় দলে যোগ দেয়ার মত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও তাই হয়েছে। বাহাত্তরে জন্ম নেয় জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক দল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।' সাতান্ন সালে গঠিত হয়েছিল পাহাড়ি ছাত্র সমিতি। উপজাতি ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সীমিত ছিল পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ভূমিকা। ছেষট্টি সালে রাঙামাটি সরকারি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্র সমিতির কাজের পরিধি বেড়ে যায়। এই সময় থেকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রীতি কুমার চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, পরিমল চাকমা, পংকজ দেওয়ান, উষাতন তালুকদার, স্নেহময় চাকমা, প্রশান্ত চাকমা প্রমুখ নেতা প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির অবদান অপরিসীম। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন অনেক নেতা ও কর্মী কর্মজীবনে পেশা হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। উনসত্তরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজেও পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন। তিনি পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন নেতা ও কর্মীদের সংগঠিত করা শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ করে পুরো উত্তরাঞ্চলে তিনি ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। এই প্রচেষ্টায় পাহাড়ি ছাত্র সমিতি যোগ্য ভূমিকা নেয়। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

কিন্তু তখন তার সাংগঠনিক শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তিনি নির্বাচনী জাঁতাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলে তখন তিনি তাঁর মনোনীত প্রার্থীও দিতে পারেন নি। কিন্তু সত্তর থেকে তিয়াত্তর, তিন বছরের রাজনৈতিক অবস্থা হয় ওলট-পালট। এই ওলট-পালটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষোভকে পুঁজি করে লারমা অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার পর জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দুটি

আসন নির্ধারিত হয়। তিয়াত্তরের সাধারণ নির্বাচনে লারমা শুধু নিজে নন, দক্ষিণাঞ্চল থেকেও জন সংহতি সমিতি মনোনীত প্রার্থী চাই থোয়াই রোয়াজাও বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া দখল ছিল রাজাদের। পরম্পরাগতভাবে মোগল, বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী রাজাদের স্বার্থ বড় করে দেখত। রাজারাও সাধারণ উপজাতিদের স্বার্থের দিকে তাকিযে কাজ করতেন না। উপজাতিদের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য রাজাদের দায়িত্বই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁদেব আসন অটল রাখতে নিজ নিজ এলাকায় স্কুল কলেজ খুলতে এবং উপজাতিবা নতুন কোন উদ্যোগ নিতে চাইলে রাজারা বিভিন্ন কৌশলে নিরুৎসাহ করতেন। সম্ভবত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চবিদ্যালয়, রাঙামাটি সরকাবী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনৈক চাকমা রাজকুমারকে পড়ানোর জন্য। দীর্ঘদিনের কাঠামোয় আঘাত হানেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। উপজাতি জনসাধারণের রাজনীতি বন্দী ছিল বাজপ্রাসাদে। লারমা সেই বাজনীতিকে নিয়ে এলেন রাজপথে। সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর আগেও কয়েকজন উপজাতি নেতা সাধারণ মানুষের হয়ে লডেছেন। কিন্তু তাঁর মত কেউ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নি। উপজাতি জনগণকেও সঠিকভাবে বোঝাতে পারেন নি যে, লড়াইটা তাদের নিজেদের। বাঁচতে কেউ কাউকে সাহায্য করেনা। বাঁচার অবলম্বন নিজেদেরই খুঁজে নিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামেব বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল অনৈক্য, সংশয় ও দূরত্ব-বোধ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে এই প্রথম অধিকাব আদায়ের স্বার্থে সব সম্প্রদায় এক হয়। এই জন্য লারমাকে বলা যায় একজন সফল বিপ্লবী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দেশের যে কোন সরকারকে অবিশ্বাসের চোখে দেখার একটা মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসনের উচ্চপদে কোন উপজাতি না থাকার দরুণ এবং আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে যখন তারা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তারা ভাবতে বাধ্য হয়, নিজেদের জেলাতেই তারা অবহেলিত। সারা দেশের প্রেক্ষিতে তাহলে তাদের মূল্য বা মর্যাদা কতখানি? সরকার বদল হলেও তাদের প্রতি প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আদৌ হবে কি? এইসব উত্তরহীন প্রশ্নের অন্তহীন স্রোতে

এবং সরকারের গঠন মূলক পদক্ষেপের অভাবে বাড়তে থাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কোন সরকারের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের গভীরতা।

তিয়াত্তরের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষ রাজনৈতিক ইস্যুর রূপ নিতে শুরু করে।

সেই সময় সরকারি উদ্যোগে শুধু শরণার্থী পুনর্বাসন নয়, কিছু ঘটনাও ঘটে, যা উপজাতিদের আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তিয়াত্তরের জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন নিয়েছিল তিন শ পনেরটি আসন। তিন শ সদস্য নির্বাচিত হতেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পনের জন মহিলা সদস্যা মনোনীত করত। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জন্য নির্ধারিত ছিল একটি মহিলা আসন। এই আসনের সদস্যা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রীমতী সুদীপ্তা দেওয়ানকে। এর পেছনে গঠণমূলক উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল। প্রথমত, উপজাতি-দের প্রতি ক্ষমতাসীন দল, আওয়ামি লিগের সদিচ্ছা প্রকাশ ঘটান। দ্বিতীয়ত, জেলা আওয়ামি লিগের কাজে গতি ও প্রাণ সঞ্চালন। তৃতীয়ত, জেলা প্রশাসনে উপজাতিদের অংশগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করা। চতুর্থত, সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে সরকারি দলের প্রতিনিধির অনুপস্থিতির শূণ্যতা পূরণ করা। কাজটা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতাদের কিংবা জেলা আওয়ামি লিগের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি বাছায়ের কাজটা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয় নি বলে উপজাতি নেতা ও জেলা আওয়ামি লিগের অভিযোগ। উপরন্তু, জাতীয় সংসদ সদস্যা মনোনীত হবার পর সুদীপ্তা দেওয়ানকে ঘিরে তৈরী হয় একটি সুবিধাবাদী চক্র। সুদীপ্তা দেওয়ানের কাঁধে বন্দুক রেখে ফায়দা তোলে পারমিট, লাইসেন্স শীকারীর দল। তাই আওয়ামি লিগ যে উদ্দেশ্যে তাঁকে সংসদ সদস্যা মনোনীত করেছিল, তার কোনটাই তিনি সঠিকভাবে কার্যকরী করতে পারেন নি উল্লেখিত চক্রের ষড়যন্ত্রে। তিনি উপজাতিদের নয়, ছিলেন আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি। তাঁর ও আওয়ামি লিগের নাম ভাঙিয়ে সুবিধাবাদী চক্রের বেপরোয়া কার্যকলাপে উপজাতিরা আরও বেশী আস্থা ও বিশ্বাস হারাতে থাকে আওয়ামি লিগের প্রতি।

স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগ সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজন জনসভায় বক্তৃতাও করেন। জনসভায় জনগণের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসভা সাধারণত কম অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতি জনগণের সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়ার অভ্যাসও নেই।

তার কারণ আগে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছিল। এই জেলার জনসভায় জনগণের উপস্থিতির সঙ্গে দেশের অন্য জেলার তুলনা করা ভুল হবে। দেশের প্রচলিত ধারণা মতে, বড় সভা হল জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। উপজাতি জনগণের নাড়ি ভাল বুঝতেন বলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম হিসেবে জনসভা বেছে নেননি। জনসভায় স্বল্পসংখ্যক উপজাতির উপস্থিতি দেখে কিছু মন্ত্রী এবং নেতা মনে করেন, উপজাতিরা সরকার বিরোধী। সরকার এবং দেশের বিরোধিতা করলে পরিণাম কি হতে পারে, তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর মত তাঁরা রাজা ত্রিদিব রায়ের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করেন। তাদের দুর্দশার জন্য রাজাকে অনেক সময় দায়ী করলেও, অধিকাংশ প্রগতিশীল উপজাতির মনে সামান্য হলেও রাজার প্রতি দুর্বলতা ছিল। সাধারণ উপজাতির ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা ছিল আরও গভীরে। এই দুর্বলতার পেছনে যুক্তির চাইতে বেশি ছিল আবেগ আর দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা অভ্যাস।

রাজা ত্রিদিব রায়কে আক্রমণ তাই উপজাতিদের, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় চাকমাদের আহত করে। এবং তা অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মনে ছড়িয়ে যেতে দেরি হয়নি। এই ধরণের মন্ত্রী এবং নেতারা—যাঁদের অনেককে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোন্দকার মুশতাক আহমেদের মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে দেখা গেছে—বোঝার চেষ্টা করেন নি যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বয়ে যাওয়া নিপীড়নের ঝড়ে উপজাতিরা অনেক কিছুর মধ্যে হারিয়েছে সরকারের প্রতি বিশ্বাসও। রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায় না। তার জন্য চাই গঠনমূলক বাস্তব পদক্ষেপ।

পাকিস্তানের নিম্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন উপজাতিদের চিহ্নিত করেছিল ভারতপন্থী। সেই একই নেতৃত্ব এবং প্রশাসন (যাদের ভেতর অনেকে হানাদার বাহিনীর সহযোগী ছিল) স্বাধীনতার পর উপজাতিদের চিহ্নিত করে পাকিস্তানপন্থী হিসেবে। ভারত উপমহাদেশ ভেঙে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। উপজাতিদের দুর্ভাগ্য, সে দেশের নাগরিক হয়েও তারা চিহ্নিত হয়ে রইল পাকিস্তানপন্থী হিসেবে। তাই তারা পায়নি সত্যিকার নাগরিক মর্যাদা।

চুয়াত্তরের শেষে বা পঁচাত্তরের প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লিগের তৎকালীন সভাপতি চারু বিকাশ চাকমা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিপাকে পড়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এবং নিগৃহীত হন। চারুবিকাশ চাকমা কর্মজীবনের শুরু থেকে বাঁশের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। তাই ব্যবসার কাজে তিনি প্রায় গভীর অরণ্যাঞ্চলে যেতেন। তিয়াত্তর থেকে শান্তিবাহিনী নামে একটি দল পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে দলটির কয়েকবার সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনার দিন, ঐ সশস্ত্র দলটিকে দমনের উদ্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী সুবলং মুখের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। চারু বিকাশ চাকমা এই খবরের কিছু জানতেন না। তাঁর স্পীডবোট সুবলং মুখের কাছাকাছি আসতে না আসতে শুরু হয়ে যায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে পুলিশের গোলাগুলি। গোলাগুলি কেন হচ্ছে, কোনদিকে হচ্ছে, কার সঙ্গে কার হচ্ছে, তা বোঝার আগে চারু বিকাশ চাকমা জলে ঝাঁপ দেন। তাঁর সাথীরা কেউ জল, কেউ বা ডাঙার জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে। গোলাগুলি থামার পর কে কোথায়, তা খোঁজ নেবার আগেই পুলিশ এসে তাদের ধরে। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ধরা পড়ায় পুলিশের সন্দেহ চারু বিকাশ চাকমা ও তাঁর দু'তিনজন সঙ্গী সশস্ত্র দলের সঙ্গে জড়িত। পুলিশ চারু বিকাশ চাকমার কোন বক্তব্য শুনল না। শুরু করে বেধড়ক মারধোর। পুলিশ সুপার চারু বিকাশ চাকমাকে ভালভাবে চিনতেন। তিনি কিন্তু মারধোর করা থেকে পুলিশদের বিরত করেন নি। চারু বিকাশ চাকমা ও তাঁর সঙ্গীদের পেটাতে পেটাতেই রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার ঘাটে আনা হয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নেয়ার সময়ও সমানে চলে পুলিশি লাঠি আর লাথি। পুলিশের এই উলঙ্গ ব্যবহারে উপজাতিদের সঙ্গে অনুপজাতিরাও সমভাবে ব্যথিত হয়। পুলিশ শান্তিবাহিনীর চার সদস্যর লাশও পেয়েছিল। রাঙামাটি মর্গের সামনে চার লাশ ও চারু বিকাশ চাকমা এবং তাঁর সঙ্গীদের ছবি একসঙ্গে তোলা হয়। তারপর তাদের নেওয়া হয় কোতয়ালি থানায়। হাজতে রাখা হয় চারু বিকাশ চাকমা ও তাঁর সঙ্গীদের। লাশ চারটি রাখা হয় থানার আঙিনায়। ঘটনার শেষ কিন্তু সেখানে হয়নি। সেইদিন পুলিশ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা মিছিল বের করে পায়ে হেঁটে, জিপে, ভ্যানে, লরিতে। তাদের স্লোগান ছিল ভয়ংকর। কল্পনা করাও কষ্টকর যে, আইন রক্ষাকারী সরকারি যন্ত্র আইন ভাঙার এমন স্লোগান দিতে পারে। একটি ছড়া

সশস্ত্র দলের সঙ্গে উপজাতিদের সামগ্রিকভাবে জড়ানোয় উপজাতিরা ক্রুদ্ধ ও শংকিত হয়। মারাত্মক কিছু ঘটার ভয়ে সেইদিনের এবং রাতের রাঙামাটি ছিল অস্বাভাবিক থমথমে। সংসদ সদস্যা শ্রীমতী সুদীপ্তা দেওয়ানের চেষ্টায় ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং সরাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলির হস্তক্ষেপে ঘটনা আর বেশি দূর গড়াতে পারেনি।

কিন্তু যা হবার, তা রোধ করা যায় নি। পরদিন চারু বিকাশ চাকমা মুক্তি পেলেন। তিনি কখনও জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না। কিন্তু সেইদিনের সুর ছিল ভিন্ন। তাঁর রাজনীতির বিরোধিতা করেন এমন অনেক উপজাতি নেতা ও সাধারণ মানুষ তাঁকে বীরের সম্মান দেখালেন। তিনি সেদিন ছিলেন না। জেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি। ছিলেন নির্যাতিত উপজাতিদের প্রতীক। জাতীয় নীতির পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমস্যা সমাধানে চারু বিকাশ চাকমার বিশ্বাস সর্বজন বিদিত। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি আওয়ামি লিগের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন নি। এমনি করে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামি যুব লিগের আহ্বায়ক রণবিক্রম ত্রিপুরাকে হয়রানি করেছিল মহালছড়ি থানার পুলিশ। জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত এবং বিশ্বাসী উপজাতি নেতাদেরও বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্দেহ ও নির্যাতন করে বস্তুত সামগ্রিক ভাবে উপজাতিদের জাতীয় মূলস্রোত থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া শুরু হয়। রাঙামাটিতে পুলিশি উন্মত্ততা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পুলিশ সুপারের বদলি ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত অফিসার ও পুলিশদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক সাজা'র দাবি করেন উপজাতি নেতারা। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ সুপার রাঙামাটিতে থেকে গেলেন। অন্যদিকে রাঙামাটির উচ্ছৃংখল ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু অফিসার ও পুলিশকে দেওয়া হয় পদক এবং প্রমোশন। এতে উপজাতিদের একটা অংশের মনে বিচ্ছিন্নভাবে সমস্যা সমাধান করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

এই সময় দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অপুঁজিবাদী অর্থনীতি বাস্তবায়নের কর্মসূচী নিয়েছিলেন। তাঁর সরকার বৃহৎ শিল্প ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে। ক্ষুদ্র শিল্পে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্দিষ্ট করে দেয়। আওয়ামি লিগ বহুশ্রেণী ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামি লিগের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রগতিশীল কর্মসূচী বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের চাপে জমির সর্বোচ্চ সিলিং এবং বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাধ্য হয়েছিলেন।

অন্যদিকে আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার কোন্দলে আওয়ামি লিগ জড়িয়ে পড়ে। অনেক নেতা ও মন্ত্রীর দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সংগ্রামের রক্তস্নাত পথে আওয়মি লিগ দেশবাসীর যে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিল, তাতে চিড় ধরে। এর জন্য এককভাবে আওয়ামি লিগকে দায়ী করা যায় না। দায়ী ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বসংকটও। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে দানা বেঁধে ওঠে সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা, ছিনতাই, পাটের গুদামে আগুন, সার কারখানায় বিস্ফোরণ, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর উপর্যুপরি বন্যা—দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সুযোগে শক্ররা দিনে দিনে জনজীবনে বাড়িয়ে তুলল সংকট। যখন প্রয়োজন ছিল জাতীয় স্বাধীনতাকে সুসংহত করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়া, তখন সমাজ জীবনের রন্ধ্রে ও শাসন ক্ষমতায় লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র বিরোধী চক্র দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তর এই নাজুক পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে একটা ক্রম হতাশার সৃষ্টি হয়। সমাজ জীবনে আসে লক্ষ্যহীনতা। এই অবস্থার অবসান এবং স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করার লক্ষ্যে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ও গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতির প্রগতিশীল ও উৎপাদনকারী সকল জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত করে সর্ববৃহৎ সার্বজনীন ঐক্যের অপরিহার্যতায় গঠন করেন জাতীয় দল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ। সংক্ষেপে বাকশাল। ন্যাপ (মোঃ), সি. পি. বি, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লিগ, সংসদ সদস্য আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে জাসদের একাংশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাকশালে যোগ দেয়।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাই থোয়াই রোয়াজার বাকশালে যোগদান উপজাতি জনগণ শুভসূচনার ইঙ্গিত বলে মনে করে। এর আগেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত উপজাতি প্রতিনিধি সরকারি দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু লারমার যোগ দেওয়ার মত গুরুত্ব তারা কেউ পান নি। কারণ উপজাতি জনগণ

বিশ্বাস করত যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ক্ষমতার লোভ নেই। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি বাকশালে যোগ দিয়েছেন।

বাকশালের শাসন কাঠামো অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায়—রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন—ভাগ করা হয়। রাঙামাটি জেলা ছাড়া বাকী দু'টো জেলার প্রশাসক বা গভর্ণর নিযুক্ত হন দুই রাজা। খাগড়াছড়ির গভর্ণর নিযুক্ত হন মং রাজা মং প্রু চাঁই চৌধুরী। বান্দরবনের গভর্ণর হন বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী। রাঙামাটির গভর্ণর মনোনীত হন জেলা প্রশাসক এ. কাদির। তাঁর মনোনয়ন উপজাতিদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেনি। কারণ তিনি উপজাতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তিনটি জেলার বাকশাল সেক্রেটারি মনোনীত হন তিন উপজাতি নেতা। রাঙামাটির সেক্রেটারি মনোনীত হন চারু বিকাশ চাকমা, খাগড়াছড়িতে অনন্ত চাকমা ও বান্দরবনে মং চ প্রু চৌধুরী। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে আশা ও বিশ্বাস কিছুটা ফিরে আসে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বাকশালে যোগ দেওয়ার পর বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, সারা দেশের আর্থিক—সামাজিক—রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপে একটা অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। শেষ হতে পারে নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনীতির স্রোতস্বিনী জাতীয় রাজনীতির গঙ্গায় মিলনের ক্ষণটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পঁচাত্তরের পনের আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন নির্মমভাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খোন্দাকার মুশতাক আহমেদ সামরিক অভ্যুত্থানের মূলহোতা কয়েকজন কর্মরত ও অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসারের পিঠে চড়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন। তাঁকে অনুসরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রী পরিষদের বেশ কিছু সদস্য।

একই সালে তেসরা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে আর একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ঐ অভ্যুত্থানেও দেশের ক্ষতি হয় অপূরণীয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর যে চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও কামরুজ্জামান জাতির নেতৃত্ব দিতে পারতেন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে এক সুপরিকল্পিত

ষড়যন্ত্রে তাঁরা নৃশংসভাবে নিহত হন। পাকাপাকি গদিতে বসার আগেই খালেক মোশাররফকে সরে যেত হয়। সাতই নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানে মারা যান খালেদ মোশারফ ও তাঁর বেশ কিছু সহকর্মী। মঞ্চে আসেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকে গণতন্ত্রের জন্য পূর্ব পাকিস্তান অনেক রক্ত দিয়েছে। তাই আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে না। হবে না আর রক্তপাত। এবার গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর গণতান্ত্রিক কাঠামো। কিন্তু স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ না হতেই চারমাসে পর পর তিনটি রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানে সব অনুমান মিথ্যে হয়। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান হলেও রক্তপাত হয়নি। পাকিস্তানের এক অংশ থেকে সৃষ্টি হওয়া বাংলাদেশে প্রতিটি সামরিক অভ্যুত্থানে রক্ত ঝরে প্রচুর।

চব্বিশ বছরের সুদীর্ঘ লড়াইয়ের চড়াই উতরাই পেরনোর পর জেগে 'ওঠা আশা' নিবে যেতে চার বছরও লাগল না। রাজনৈতিক কিছু নেতার অসাধুতায় এবং সামরিক অভ্যুত্থানে অভ্যুত্থানে রক্তাক্ত বাংলাদেশ অস্থির ও অনিশ্চয়তায় টালমাতাল হয়ে ওঠে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা

একটি মানব প্রজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কি করে এবং কি কারণে নিজের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারায় এবং ধীরে ধীরে তার জাতিগত অস্তিত্ব (Ethnical Entity) অবলুপ্ত হয়, সেই সম্পর্কে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-বিদ্‌রা নানা কারণ উপস্থিত করেছেন। প্রধানতম কারণ দু'টি। শিল্পায়ন বা আধুনিকীকরণের অনিবার্যতা। আর দ্বিতীয় কারণ সরকারের উচ্ছেদমূলক নীতি।

একটি দেশের শিল্পোন্নয়নে প্রয়োজন নতুন জমি। কাঁচা মাল সরবরাহের উপযুক্ত ক্ষেত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি কাগজের কলের কথা ধরা যাক। শুধু যন্ত্রপাতি বসালেই তো আর উৎপাদন হবে না। তার জন্যে চাই কাঁচা মাল। কাগজ তৈরির কাঁচা মালের মধ্যে বাঁশই প্রধান। তাই যেখানে বাঁশের সরবরাহ প্রচুর তার কাছাকাছি কাগজ কল প্রতিষ্ঠা লাভজনক। কেননা তাতে কাঁচামাল আমদানির জন্য খরচ কম হয়।

কিন্তু সেই বাঁশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় হয়তো এমন একটি অঞ্চলে, যেখানে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও নিজ নিজ ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বাস করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন জাতিসত্তা। কলকারখানা গড়ে উঠলেই তার কাছাকাছি গড়ে উঠবে নতুন বসতি—শ্রমিক বস্তি, বাজার। চলবে মানুষের আনাগোনা। এক-দিকে, কল-কারখানায় শ্রম ও কাঁচামালের যোগান এবং বাজারে কৃষি উৎপাদন বিক্রির মাধ্যমে স্থানীয় আদিবাসীদের একটা অংশের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা অর্জিত হয়, অন্যদিকে দীর্ঘদিন নতুন বসতির জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার প্রভাবে তাদের নিজস্ব সামাজিক জীবন প্রথার ছন্দপতন ঘটে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে স্থানীয় আদিবাসীদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। তাদের স্বকীয়তায় ধ্বস নামতে শুরু করে। আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আবার অশুভ কিছুর আশংকা করে কল-কারখানা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর অরণ্যাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় বাঁধে। বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে

করতে তাদের জনসংখ্যা কমে যায়। মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রজননের হারও হয় নিম্নমুখী। এমনি করে একটা পর্যায়ে তাদের অবলুপ্তি ঘটে। যারা শহরাঞ্চলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অনুকরণে বেঁচে থাকে বা দুর্গম গভীর অরণ্যাঞ্চলে মানবেতর জীবন যাপন করে, তাদের জাতিগত অস্তিত্ব বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। শিল্প বা আধুনিক সভ্যতা বিকাশের ঐতিহাসিক অনিবার্য পরিণতিতে একটি বা একাধিক মানব প্রজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসমাজ সমূহের জাতিগত অস্তিত্বের ওপর আঘাতকে সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, ভিকটিম অফ প্রোগ্রেস বা প্রগতির শিকার।

যে কোন দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের আলাদা অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে তারা বিশেষভাবে মনযোগীও। তাদের জাতিগত অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, এমন শাসনতান্ত্রিক গ্যারান্টি চেয়ে তারা সরকারের নিকট দাবি পেশ করে। কোন কোন রাষ্ট্র সংখ্যালঘু জাতিসত্বা সমূহের স্বাতন্ত্র্য শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকার করে নেয়। গঠনমূলক উপায়ে খুঁজে নেয় তারা স্থায়ী সমাধানও। আবার কোন কোন রাষ্ট্র সেই পথের ধারে কাছে না ঘেঁষে উল্টো পথ ধরে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবি পরে ভয়ঙ্কর হুমকী হয়ে দাঁড়াবে বিবেচনা করে তারা তাদের স্বতন্ত্র্য অস্তিত্ব ধ্বংস করার নীতি অবলম্বন করে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের জনবিন্যাস পালটিয়ে দেওয়াই এই নীতির প্রধান লক্ষ্য। একটি অঞ্চলের জনবিন্যাস পালটিয়ে দিয়ে সেই অঞ্চলের আদিবাসীদের নিজভূমে পরবাসী করাকে ইংরেজীতে বলা হয় হাইনিনাইজেসন। হাইনিনাইজেসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজকের তিব্বত এবং শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চল। তিব্বতীরা তিব্বতে যাতে কোনদিন স্বাতন্ত্র্যের দাবি জানিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই জন্য চীন ব্যাপকহারে তিব্বতে চীনাদের ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই একই কারণে শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে অতামিলদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে সেই দেশের সরকারের উদ্যোগে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের মূল কারণ সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক পুনর্বাসন। তাই প্রশ্ন, উপজাতিরা কি চোখে দেখছে এই পুনর্বাসন? পুনর্বাসনই বা কেন? তারা কি প্রগতির শিকার? না হাইনিনাইজেসনের বলি? পার্বত্য চট্টগ্রাম যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং উপজাতিরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কতটুকু সচেতন ও যত্নশীল, তা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে।

বলা যেতে পারে সমাজে শিক্ষার প্রসারের ফলে অর্জিত এই চেতনাবোধ তাদের রাজনৈতিক শক্তির উৎস। একদিকে যেমন জাতীয় দলগুলোর উপজাতিদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থতা, অন্যদিকে তেমনি একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা যে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে জাতিগত-ভাবে (এথ্‌নিক্যাল) আলাদা ও পশ্চাদপদ, ভিন্ন সামাজিক প্রথা, ভিন্ন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত এবং তাদের বিকাশের নিজস্ব ধারা অক্ষত ও অব্যাহত থাকবে এমন শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের দাবি দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা ভোটাধিকার প্রাপ্তির পর, একবার ছাড়া প্রতিবারই নির্দল উপজাতি প্রার্থীকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে জাতীয় সংসদে। (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জেলা ভিত্তিক সংগঠন। জাতীয় সংসদে জনসংহতি সমিতির দুই সদস্যকে নির্দলই ধরা হত)। উপজাতিদের আক্ষেপ, পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসনকালে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও তাদের এই মনোভাব মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা হয়নি। জাতীয় গঠনমূলক কাজেও তাই খাটানো হয়নি উপজাতিদের কর্মশক্তি। বরং তাদের দাবি হুমকি হিসাবে ধরে নিয়ে বৈরী পদক্ষেপ নিতে শুরু করে সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা মনে করে, বিশ্ব সভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতির শিকার তারা এমনিতেই। তার ওপর উপজাতি স্বার্থবিরোধী সরকারি নীতির ফলে বর্তমানে তাদের অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে।

কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যার ফলে একটা এলাকার উপজাতিদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেলেও তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত তেমনভাবে টলেনি। বরং শিক্ষার প্রসার, বহির্বিশ্বের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দেবে আর নেবে, মিলাবে আর মিলবে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাতিতে জাতিতে ভাব আদান-প্রদানের এই ভিত্তিতে অনেক অনুন্নত জাতি, উন্নত জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজেদের উন্নীত করেছে। মোগলরা ভারতে আসার পর নিজেদের স্বীয়কতা যেমন বিসর্জন দেয়নি, তেমনি জোর করে তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং দুই ধারার মিলনে গড়ে উঠেছে উন্নততর সভ্যতা। উপজাতি বুদ্ধিজীবীদের মতে, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সার্বিক প্রভাব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর স্বাভাবিক-ভাবে পড়বেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক

প্রভাব গ্রহণ করে বিকাশের নিজস্ব ধারা সচল রাখতে সক্ষমও। কিন্তু যখন এই প্রভাব অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত গতিতে বাড়ানো হয়, যখন সরকারি উদ্যোগে দেশের অন্যান্য জেলা থেকে ব্যাপকহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক ঢুকিয়ে দিয়ে উপজাতিদের জমি দখল করানো হয়, তখন উপজাতিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বিতা ধ্বংস করার সরকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই পদক্ষেপে তখন তারা ভাবতে বাধ্য হয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য নয়, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা হওয়ার জন্যই তাদের ওপর সরকারি এই আক্রমণ। চীন অধিকৃত তিব্বতের তিব্বতী কিংবা শ্রীলংকার তামিলদের চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা তাদের নির্মম ভাগ্য বেশি মেলাতে চায় চিলির ভাগ্যহত মাপুচে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। চিলির সামরিক সরকার উনিশ শ উনাশিতে 'ডিক্রী ল ২৫৬৮' জারি করে। এই আইন বলে মাপুচে জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ভিত্তিক জমি-মালিকানা স্বত্ব শুধু অস্বীকার নয়, মাপুচে জন-গোষ্ঠীর ওপর নেমে আসে জেনারেল পিনোচেটের নির্মম নির্যাতন। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এথনোসাইডের (Ethnocide) মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে মুছে দেওযার সরকারি নির্দেশ।

এখন দেখা যেতে পারে সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন, উপজাতিদের ভাষায় অনুপ্রবেশ শুরু হয় কখন? কি ভাবে হচ্ছে এই পুনর্বাসন? স্থানীয় উপজাতিদের প্রতিক্রিয়াই বা কী?

ভারত বিভক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিবাদে রাঙামাটি ও বান্দরবনে যথাক্রমে ভারত ও বার্মার পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। কাজেই পাকিস্তান সরকার ধরেই নিয়েছিল যে, জেলার অমুসলিম জনগোষ্ঠী সমূহের আনুগত্য সহজলভ্য নয়। তিব্বত—বর্মী বংশভূত জনগোষ্ঠী সমূহের আনুগত্য অর্জনে ন্যূনতম কাঠখড় পোড়াতে রাজিও ছিল না পাকিস্তান সরকার। তাদের বরং পছন্দ ও বিশ্বাস ছিল সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উপজাতিরা বাড়াবাড়ি করতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনের জন্য বৃটিশ প্রবর্তিত বিশেষ ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটায় পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই। শাসনতন্ত্রে ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলবৎ রাখলেও রেগুলেশনের ধারা ভঙ্গ করে পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে সরকারি উদ্যোগে প্রথম পুনর্বাসন শুরু হয় রাঙামাটির নানিয়াছড়, লংগদু, রামগড় মহকুমার তবলছড়ি, বেলছড়ি, মানিকছড়ি এবং বান্দরবন মহকুমার আলিকদম, লামা ও

নাইক্ষ্যংছড়িতে। উপজাতি নেতাদের প্রবল প্রতিবাদ, স্মারকলিপি পেশ, পুনর্বাসন অঞ্চলে উপজাতি অনুপজাতি সংঘর্ষ এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা সেই সময়ের মত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু যাদের পুনর্বাসিত করা হয়, স্থানীয় উপজাতিদের বার বার দাবি সত্ত্বেও, সরকার তাদের তুলে নেননি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার পুনর্বাসন শুরু হয় ছেষট্টিতে। ছেষট্টিতে ভারতের বিহারে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার পরিবার গৃহহারা স্বজনহারা হয়। লক্ষাধিক বিহারী মুসলিম পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছাড়া তারা সঙ্গে কিছুই আনতে পারে নি। সেই আগুন তারা ছড়িয়ে দেয় পূর্ব পাকিস্তানে। সম্ভবতঃ এতে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর মদত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ আপ্রাণ ও অক্লান্ত চেষ্টা করে দাঙ্গা রুখেছিল সেইবার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিহারী মুসলিমদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দেওয়া হয় ঢালাও সুযোগ। বিহারী মুসলিমরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলিমদের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী মুসলিমদের সঙ্গে নৈকট্য ও আত্মীয়তা বোধ করত বেশি। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিহারী মুসলিমদের তাদের তাবেদার হিসেবে তৈরী করতে আরম্ভ করে। প্রয়োজনে যাতে বাঙালীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়, সেই চিন্তা মাথায় রেখে, তাদের পুনর্বাসন শিবির গড়ে তোলা হয় চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও ঢাকা শহরের চারপাশে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কত নিখুঁত ছিল, তার প্রমাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিহারীদের বাঙালী নিধন যজ্ঞ।

বিহারী উদ্বাস্তুর এক অংশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। তাদের রক্তে তখনও ছিল দাঙ্গার উন্মাদনা। সরকার খাস জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেয়। খাস জমি বলতে বেশির ভাগ ছিল আবাদ অযোগ্য পাহাড়। এমনিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির উর্বরতা তুলনামূলক ভাবে দেশের অন্য জেলার চাইতে কম। সেক্ষেত্রে পাহাড় চষে ফসল ফলানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিহারী উদ্বাস্তুরাও কষ্টের পথে না গিয়ে সোজা পথ ধরে। উপজাতিদের তৈরী করা জমি দখল করা শুরু করে। স্থানীয় উপজাতিরা সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়। বিচার চায়। সরকারের বিস্ময়কর

(উদ্দেশ্য প্রণোদিত ?) নীরবতা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় সরল উপজাতিদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার করে।

ছেষট্টি সালেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সরকারি সফরে চীনে যান। তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী। ফজলুল কাদের চৌধুরী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে কিছু কাজ করেন তন্মধ্যে অন্যতম হল আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বহির্ভূত এলাকা (এক্সক্লুডেড এরিয়া)-র মর্যাদা তুলে দেওয়া। সম্ভবতঃ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য প্রতিবেশী জেলাগুলিতে আগেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। কয়েক হাজার অনুপজাতি পরিবার দু'দিনেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে লুটপাট করে উপজাতিদের জমি দখল নিয়ে উপজাতিদেরই ঘরছাড়া করে।

সেই সালেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এগারজন ভূতত্ত্ববিদ, মৃত্তিকা বিশারদ, উদ্ভিদবিদ, অর্থনীতিবিদ ও কৃষি বিশারদদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলের জমি সর্বোচ্চ পরিমাণে কাজে লাগিয়ে এলাকার উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার একটি দল গঠন করে। দলটি দুই বৎসর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ চালায়। কাজের শেষে তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, পার্বত্য অঞ্চল হওয়ার দরুণ প্রচলিত প্রথা অর্থাৎ জুম চাষ পদ্ধতি ভাল হলেও তার অবসান করতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির কল্যাণের স্বার্থে উপজাতি জনগণ শুধু বনজ সম্পদ উৎপাদনের অনুমতি পাবে। ভোগের নয়। এই বনসমীক্ষা ও মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে হালকা বসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আয়তনগত দিক থেকে তখন ময়মনসিংহ জেলার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু বনসমীক্ষা ও মাষ্টার প্ল্যানে শুধু আয়তন ধরা হয়েছিল। চাষযোগ্য জমি এবং জনসংখ্যার অনুপাত ধরা হয়নি। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কম হলেও, খাদ্যে ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। পয়ষট্টি-ছেষট্টি সালের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন গৃহীত জরীপে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫,০৭৫ বর্গমাইল, অর্থাৎ ৩২,৫৭,৫২০ একর। অরণ্যভূমির পরিমাণ ২৯,০২,৭৩৯ একর এবং সর্বমোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৭৩,০০২ একর। নেট ফসলকৃত জমি হচ্ছে ১,৩০,০০ একর। পতিত জমির পরিমাণ ১০,০০০ একর। অপর পক্ষে সমগ্র এলাকায় ৪৫,০০০ একর জমি চাষাবাদের অযোগ্য। আর

১,৭০,৮৯৭ একর জমি চাষাবাদের জন্য মোটেই লভ্য নয়। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে মোট উর্বর আবাদী জমির চল্লিশ শতাংশ জলমগ্ন হয়। ফলে জমি ও জনসংখ্যার অনুপাতও কমে আসে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা একেত পাহাড়ী অঞ্চল, তদুপরি সমস্ত এলাকার প্রায় তিন চতুরাংশ সংরক্ষিত, প্রোটেক্টেড এবং অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল। সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ৯৯৬ বর্গমাইল, প্রোটেক্টেড বনের পরিমাণ (জুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ) ৫৪.২০ বর্গমাইল। আর অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনের পরিমাণ ৩,৩৩১,১৭ বর্গমাইল। সমতল ও আবাদযোগ্য জমির প্রাচুর্য এই জেলায় কোনদিন ছিল না। সমতল ভূমি বলতে ছিল পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপতকা। সেখানেই চাষ হত। কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের ফলে পঞ্চাশ হাজার একর জমি ডুবে যাওয়ায় চাষযোগ্য জমির সংকট পার্বত্য চট্টগ্রামে ততটা হয়, যতটা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যাঞ্চলে। কাজেই দ্বিতীয় বৃহত্তম হলেও বাসযোগ্য ভূমি এবং জমির উৎপাদনী ক্ষমতার বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পরিকল্পনায় যতটা ধরা হয়েছিল, ততটা হালকা বসতি পূর্ণ ছিল না। সুতরাং উপজাতি বুদ্ধিজীবী, যাঁদের এই পরিসংখ্যান অবিগত, তাঁরা ধরেই নেন, বনসমীক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের মাষ্টার প্ল্যান সরকারি অজুহাতের মোড়ক মাত্র। আসল উদ্দেশ্য, অন্য জেলা থেকে লোক এনে পুনর্বাসন। আর সাধারণ উপজাতিরা, যারা পরিসংখ্যান জানে না, বুঝেও না, তারা ভাবল, তাদের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করতে এটা একটা সরকারি ষড়যন্ত্র।

পাকিস্তান আমলে সরকারী উদ্যোগে যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক বাইরের জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন অগ্নিগর্ভ নয় মাসে এবং স্বাধীনতাত্তোর বিশৃঙ্খল সময়ের সুযোগে। আইন-শৃঙ্খলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসার পরও বিভিন্ন জেলা থেকে লোক প্রবেশ অব্যাহত থাকে। সেই সময় তাদের হাতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ইস্যু করা বিনা পয়সায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার পাশ দেখা গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। তাই ব্যাপকহারে পুনর্বাসন শুরু করার জন্য উপজাতি জনগণ বাংলাদেশের প্রথম সরকার, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে দায়ী করে। স্বাধীনতাত্তোর পরিবেশে যে কোন সরকার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পদক্ষেপ নাও নিতে পারে, এমন নজীর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপজাতি পুনর্বাসন উপজাতিদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করছে

জেনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনর্বাসনের হার অনেক কমিয়ে এনেছিলেন। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তাঁর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন বন্ধ করার ও অবৈধভাবে যারা উপজাতিদের জমি দখল করে রয়েছে, তাদের সেই জমি ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে অন্য জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক ঢোকানো সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি তিনি বাকশাল গঠনের পূর্বে সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দিয়েছিলেন।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বলাভ করে দেশ স্বাধীন হবার পর, আওয়ামি লিগ সরকারের আমলেই। সরকারি জুন কর মওকুফ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে উপজাতি ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণ, উচ্চ শিক্ষার জন্য তাদের বিদেশ পাঠানো, চাকরী ও ব্যবসার ক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি ও চট্টগ্রাম বেতার থেকে উপজাতি অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় তখন থেকে। সেই সময়ই সরকারের উৎসাহে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে উপজাতি গল্প, ছড়া, কবিতা, লোকগাঁথা, রূপকাহিনী পুস্তাকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর অস্থিতিশীল অবস্থা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ সরকার উপজাতিদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্য উপজাতি নেতাদের পরিচালনাধীনে উন্নয়ন বোর্ড, বিশেষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন সমেত বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে নি। পরবর্তীতে অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় আসা দেশের প্রত্যেকটি সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত প্রকল্পগুলো নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন ঘটিয়ে চালু করার চেষ্টা চালায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের হার তীব্র ও ভয়ংকর আকার ধারণ করে পচাত্তরের পনেরই আগষ্টের পর সারা দেশে যখন নেমে আসে সামরিক শাসন। বর্তমানে পুনর্বাসনের অর্থই হচ্ছে, উপজাতিদের জমিতে বাইরের জেলার লোক বসানো।

'ন্যাশনাল কমিশন ফর জাস্টিস এ্যাণ্ড পীস,' ঢাকা, ১৯৮৩'র প্রতিবেদন, দি ল্যাণ্ড প্রবলেম অফ হিল ট্রাইবেলস্, বান্দরবন এলাকার উপজাতিদের নিয়ে লেখা হলেও তা সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং

১। মানবেন্দ্রনারায়ণ লারমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, ১৯৭৫, রাঙামাটি।

সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা তাদের জমি হারাচ্ছে।

এক, বিভিন্ন সরকাবি সংস্থা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ। দুই, ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে জমি দখল, তিন, জবর দখল।

: সরকারি সংস্থার জমি অধিগ্রহণ :

বৃক্ষ রোপন, ফলের বাগান, পুনর্বাসন ও বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজেব নামে সরকারেব বিভিন্ন সংস্থা খাস জমির সঙ্গে উপজাতিদের আবাদী জমিও অধিগ্রহণ করছে। অধিগ্রহণের সময় অসৎ সরকারি কর্মচারিরা জমির ক্ষতিপূরণের হার নিচুতে বেঁধে দেন। জমির শ্রেণী বিভাগ করা হয় তিন শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীর জমির ক্ষতিপূরণের হ র একর প্রতি চল্লিশ হাজার টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী পনেব হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর জমির সর্বোচ্চ ক্ষতি পূরণের হার একর প্রতি পনের হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট অফিসাররা জমির শ্রেণী বিভাগ ও ক্ষতি পূরণের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন। অনেক সময় তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপজাতিদের জমির দাম ও পরিমাণ কমিয়ে দেন।

সম্প্রতি কালাঘাটা বন বিভাগ বেশ কয়েক একর জমি অধিগ্রহণ করে। জমির দর ছিল একর প্রতি কুড়ি হাজার টাকা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসাররা জমির শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে ক্ষতি পূরণের হার বেঁধে দেন একর প্রতি আট হাজার টাকা।

বস্তুত, কি করে ক্ষতি পূরণ পেতে হয়, কারা ক্ষতি পূরণের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন, কোথায় বা ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়, অধিকাংশ উপজাতিরই তা জানা নেই। বাধ্য হয়ে তাই তাদের দালাল ধরতে হয়। দালাল শ্রেণীর লোকেরা তাদের ঠকিয়ে ক্ষতি পূরণের সিংহভাগ টাকা নিয়ে নেয়। এমন কি, সব টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবার ঘটনাও বিরল নয়।

বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জুম চাষ বন্ধ করতে সরকার উপজাতি পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশে আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীতে উপজাতি পরিবার পিছু পাঁচ একর আবাদযোগ্য জমি এবং আনুসঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্য নগদ ছয় হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়। কথা ছিল এই ব্যবস্থা শুধু মাত্র উপজাতিদের জন্যেই। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন জেলা থেকে অনুপজাতি

পরিবার এনে যৌথ খামারের জমিতে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তারাও উপজাতিদের সমপরিমাণ জমি এবং টাকা পাচ্ছে। অধিকন্তু, বাড়িঘর তৈরি করার জন্য তাদের পরিবার পিছু পনের হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, যার কথা উপজাতি পুনর্বাসন প্রকল্পে আদৌ উল্লেখ ছিল না।

শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলায় আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্দেশ্যেরও ফারাক রয়েছে। অন্যান্য জেলায় বাসস্থানের সুবিধার্থে ও কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে কৃষকদের সামিল করা হচ্ছেও বুঝিয়ে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য নিয়ম? এই জেলায় আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার গড়ে তোলার উদ্দেশ্য, প্রথমত, মিলিটারির সঙ্গে শান্তি বাহিনীর (পার্বত্য চট্টগ্রামে তৎপর সশস্ত্র একটি উপজাতি দল) সংঘর্ষ লাগছে এমন এলাকা উপজাতি শূন্য করা। দ্বিতীয়ত, উপজাতি স্বার্থবিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপজাতি জনগণের সম্ভাব্য সংগঠিত বাধা নির্মূল করা। তৃতীয়ত, উপজাতিদের উচ্ছেদ করে তাদের জমিতে অন্য জেলার লোকদের পুনর্বাসন দেওয়া। সরকার নিয়ন্ত্রিত আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার এলাকায় যেতে অস্বীকার করলে উপজাতিদের উপর চালান হয় অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। উপজাতি গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার এলাকায় যেতে উপজাতিদের বাধ্য করা হয়। কোন প্রকার ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় না। বরং আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামারে নিয়ে গিয়ে উপজাতি পুরুষদের পিটিয়ে বা অনাহারে মারার ব্যবস্থা করা হয়। মহিলাদের করা হয় ধর্ষণ। চিকিৎসার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। যৌথ খামারে বা আদর্শ গ্রামের নমুনা দেখে উপজাতিরা এইগুলোর নাম দিয়েছে নির্যাতন শিবির। লণ্ডনস্থ 'বাংলাদেশ পিপলস ডেমক্রেটিক মুভমেন্টে'র আপীল মতে, 'নিরপেক্ষ অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তোলা যৌথ খামার বা আদর্শ গ্রামগুলোর তুলনা করেছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামী কৃষকদের জন্য নির্মিত মার্কিনী গ্রামের (ষ্ট্রাটেজিক ভিলেজ) সঙ্গে।' রাঙামাটির বিলাইছড়ি এবং বাঘাইখালি ইউনিয়ন এবং খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনের কয়েক জায়গায় কয়েকটি যৌথ খামার বা আদর্শ গ্রাম গড়া হয়েছে। অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ উপজাতিরা যখনই সুযোগ পাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার থেকে গভীর অরণ্যে। যৌথ খামার সম্পর্কে উপ—

জাতিদের মনে এত তীব্র ঘৃণা জন্মেছে যে, সরকার ঘাঘরাতে একটি যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করবে শুনে অনেক উপজাতি ঘাঘরা ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র।[১]

জমি বরাদ্দের বেলায়ও দেখা যায় বৈষম্যমূলক নীতি। জেলা ও মহকুমা প্রশাসকরা জমি বরাদ্দ করার মালিক। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাঁরা সাধারণত কদাচিৎ উপজাতি পরিবার পিছু আধ কিংবা এক একরের বেশি জমি বরাদ্দ করেন। বৃটিশ শাসন আমলে একটি উপজাতি পরিবার পঁচিশ একর জমি ভোগ করতে পারত। পাকিস্তান সরকার তা কমিয়ে করেছিল দশ একর। বাংলাদেশের মিলিটারি সরকার তা আরও কমিয়ে করেছে পাঁচ একর। জমি সংক্রান্ত এই আইন দেশের অন্য কোন জেলায় চালু নেই। উপজাতিরা না পারলেও অনুপজাতি একটি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন পরিমাণ জমির মালিক হতে পারে। বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি পরিবার পঁচিশ থেকে তেত্রিশ একর পর্যন্ত জমি রাখতে পারবেন। কিন্তু এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য নয়। মোদ্দা কথা হল, উপজাতিদের জমি বহিরাগত শরণার্থীদের বিলি করে দেওয়ার স্বার্থে মিলিটারি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা নিয়ম চালু করেছেন। এই নিয়মের ফলে ভূষণছড়ার গগেন্দ্র লাল দেওয়ান ও প্রবোধচন্দ্র দেওয়ান তাঁদের জমির বিরাট অংশ পুনর্বাসনের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনি করে হাজারো উপজাতি পরিবার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

যারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ ও নিজেদের বাড়িঘর জমি ছাড়তে অস্বীকার করছে, দুষ্কৃতির অভিযোগ এনে তাদের উপর অত্যাচার চলছে। মিলিটারি এসে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে। নির্যাতন শেষে ক্যাম্প থেকে জীবিত যারা ফিরে এল, তারা দেখছে তাদের ঘরবাড়ি জমি বেদখল হয়ে গেছে।

তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতি পরিবারের প্রধানই শুধু জমি বরাদ্দ নিতে পারে। পরিবারের অন্যরা নয়। কিন্তু অনুপজাতি একটি পরিবার পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছাড়াও পরিবারের সাবালক ছেলের নামে আলাদা জমি ও অর্থ-মঞ্জুরী পেতে পারে। অনুপজাতি পরিবার পিছু মঞ্জুরী করা টাকা একবারে দেওয়া হয়। কিন্তু উপজাতিদের তা দেওয়া হয় দৈনিক কুড়ি টাকা করে। মঞ্জুরী-কেন্দ্র থেকে উপজাতিদের অনেকের

১। সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল এ্যানুয়েল রিভিউ (১৯৮৩) নং ৪৩, লণ্ডন, পৃঃ ১১৮।

বাড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল। এমন কি ষাট মাইল দূরে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা ঘুরপথে মজুরী-কেন্দ্রে আসতে তাদের একদিনের বেশি লেগে যায়। প্রতিদিন এসে টাকা নিয়ে যাওয়া শুধু কষ্টকরই নয়, প্রায় অসাধ্য। তারপরও তিনমাস টাকা পাওয়ার পর উপজাতি পরিবারকে (যারা যে কোন ভাবে দিনের টাকা দিনে নিতে পারে) অফিসে এসে শুনতে হয় সব টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে।

: ভুয়া দলিল :

জুম চাষ ও অরণ্যাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ উপজাতির প্রধান জীবিকা। বর্তমানে জুম চাষ বন্ধে সরকারি ঘোষণা ও জঙ্গল থেকে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ হওয়াতে, এবং বিকল্প কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দরুণ তাদের জীবনে নেমে এসেছে দুর্বিসহ অর্থনৈতিক দুর্দশা। বছরের অর্ধেকের চেয়ে বেশি সময় তাদের অর্ধাহারে ও অনাহারে কাটাতে হয়। সাময়িক-ভাবে আর্থিক সংকট লাঘবের জন্য তারা অনেক সময় মহাজন শ্রেণীর কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয় কিংবা সামান্য যা জমি আছে তা বন্ধক রেখে, কিছু টাকা সংগ্রহ করে। বন্ধকের টাকা ফেরৎ দিতে না পারলে বা পারলেও, নানা ছল-চাতুরি করে মহাজনেরা সেই জমি স্থায়ীভাবে দখল করে নেয় এক শ্রেণীর অসাধু সরকারি কর্মচারীর যোগসাজসে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক পুনর্বাসনের সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয় দেশের কয়েকটি দৈনিক ও সাময়িকীতে। আশির দশই অকটোবর প্রকাশিত দৈনিক গণকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উপজাতিদের প্রবল প্রতিবাদ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলার এক লক্ষ অনুপজাতি পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুর্ণবাসনের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। পরিবার পিছু বিনামূল্যে আড়াই একর সমতল জমি অথবা সমতল-অসমতল মিলিয়ে চার একর জমি বা পাঁচ একর পাহাড়ি জমি এবং নগদে তিন হাজার দুইশত টাকা দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তা ছাড়া, চার মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে বিনামূল্যে পরিবার পিছু বার সের গম দেওয়া হবে। প্রয়োজনে এই অনুদান আরও ছয়মাস বাড়ানো যেতে পারে। সৌদি আরব ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে সরকার এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য দেশের প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে নিজ নিজ জেলার ভূমিহীন ও ভাসমান জনসংখ্যার তালিকা প্রস্তুত করতে সরকার

এক গোপন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন আশির সেপ্টেম্বরে। সরকার অস্ট্রেলিয়া, বৃটিশ এবং ইউ. এন. ডি. পি. ফাণ্ড রাস্তাঘাট তৈরির কাজে ব্যবহার করছে। সিডা (সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) বেশ কিছুদিন কাজ করার পর প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে গেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকারের অনুদানে চেঙি ভ্যালী রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা এলাকার রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। ইউনিসেফ পুনর্বাসন শিবির এবং তথাকথিত যৌথ খামারে পানীয় জল সরবরাহের দিকটি দেখাশোনা করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পুনর্বাসন শিবিরের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুনর্বাসন পাওয়া শরণার্থীদের অর্থনৈতিকভাবে স্ব বলম্বী করতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক পশুপালন ও মৎস্য চাষের বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।[১]

পুনর্বাসন পরিকল্পনা যেন জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা দমনের অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক মিলিটারি মোতায়েন করেছিল জিয়া সরকার। পুনর্বাসনের কাজে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করার পরই উপজাতি সমস্যা নূতন ও জটিল আকার ধারণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েনের উদ্দেশ্যই হল সেখানে সশস্ত্রভাবে তৎপর উগ্রপন্থীদের দমন, এই কথা সুস্পষ্টভাবে সরকারি বয়ানে উল্লেখ থাকলেও

SECRET

Commissioner
Chittagong Division

Memo No. 66(9)C

To : Mr.

It has been decided that landless/river erosion effected people from your district will be settled in Chittagong Hill Tracts (CHTS). The settlement will be done in selected zones and each family will be given khas land free of cost according to the following scale :

Plain land	....	....	$2\frac{1}{2}$ acres
Plain and dumpy mixed	....	....	4 "
Hilly land	....	....	5 "

It has been decided that you will send 5,000 families.

১। আই. এফ. ও. আর-এর এক ইউরোপীয় সদস্যের প্রেরিত রিপোর্ট চ ২৮শে মার্চ, ১৯৮৩, নেদারল্যান্ড।

You are requested to collect particulars of intending and suitable families from the Chairman of the concerned Union Parishads sought them out and furnish list to the Deputy Commissioner, CHTS, through special messenger by the 30th of Spet./80 at the latest. To keep paper record of the selected settlers, group leaders and issue of Identity Card in all the districts in an uniform manner, detail guidelines have been prepared (copy enclosed) so that you can ensure strict compliance of the concerned Union Parishad Chairman.

It is the desire of the Govt. that the concerned Deputy Commissioner will give top priority to this work and make the programme a success.

You are requested to immediately call a meetting of the concerned Chairman, Union Parishads and give them detailed instructions in the matter.

I would like to have a report about the action taken by you in tne matter by 15.9.80 positively for information of the Govt.

Sd/- Saifuddin Ahmed
4.9.80
Commissioner
Chittagong Division.

SECRET

Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh,
Office of the Deputy Commissioner, CHTS.
Nemo No. 1025(9)C Dt. Rangamati, 15th Sept./80.
From : Mr. Ali Haider Khan
Deputy Commissioner
Chittagong Hill Tracts.

To : Mr.

Sub : Settlement of Landless non-tribal families in CHTS.

2nd Phase.

With reference to our discussion in Dacca on 21.8.80 and reference to Commissioner, Chittagong Divition's letter No. 66(9)C dt. 4.9.80 on the above noted subject, I furnish below a guideline regarding the programme of settlement of landless non-tribal families from other districts in CHTS :-

1) Selection of families should be complited by 15th Oct. 80.

2) The Chairmon of the Union Parishads concerned will issue Identity Cards to the slected families in the forma enclosed at Annexure (A).

3) Name of families groupwish should be sent to us by 22nd October/80. On receipt of these lists we shall decide as to where they will be rehabiliated and shall indicate to you on which dates the groups should report to the reception centre at the Haji Camp (Pilgrimage Camp), Chittangong.

4) At the reception centre an officer will take care of the settlers and will make arrangements for there journies to the rehabilitation blocks. The settlers will, however, arranse their own food.

5) At the reception centre settlers will be given take 200/- per family and on their arrival at their rehabilitation blocks they will be paid another instalment of taka 500/-. After that each family will be given further grants (C) taka 200/- per month for five more months. In addition for 6 monts the settlers will be given 12 seers of wheats per family per week under Food for Work programme for construction of their own houses, reclaiming their lands, making village roads for them and for digging tanks in their own parts (area). For another six months there will be provision for wheat under strick Food for work programme.

In rehabilitation blocks each family will be settled with khas land at the following rate :

(1) 5 acres hilli land

(2) 4 acres mixed land

(3) 2·5 acres paddy land

I enclose herewith an annexure 'B' an instruction for the Chairman of the Union Parishad where from the families will be selected.

Sd / -Ali Haider Khan

Deputy Commissioner

Chittagong Hill Tracts.

কার্যত দেখা যাচ্ছে, সেনাবাহিনী উগ্রপন্থীদের দমনের চাইতে পুনর্বাসন কাজেই সরকারকে সাহায্য করেছে বেশী। জবর দখলের মাধ্যমে উপজাতিদের তাদের জমি থেকে উৎখাত করার প্রক্রিয়া মিলিটারি মোতায়েনের পরই জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু সেনাবাহিনী কি ভাবে বাস্তবায়িত করেছে এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা ? 'সাধারণত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে, তা খুঁটি গেড়ে চিহ্নিত করার পর তার আশেপাশে মিলিটারি ক্যাম্প বসান হয়। তারপর খোলা হয় পুনর্বাসন শিবির। পুনর্বাসন পাওয়া এক শ্রেণীর লোক মিলিটারির মদতে ও প্ররোচনায় উপজাতিদের উপর নানা ধরণের অত্যাচার চালায়। যেমন, জোর করে ধান কাটা, ফলগাছ নষ্ট করে দেওয়া। উপজাতি জনগণ স্থানীয় ও জেলা কর্তৃপক্ষকে এই সব ঘটনা বারবার জানিয়েও কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে এক সময় তিক্ত-বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ি-জমিতেই তখন বাইরের জেলা থেকে নিয়ে আসা লোকেদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়।'[১]

পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি মোতায়েন শুরু হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর

১। পিটার নিসওয়াণ্ড, আপ্ হিল প্রবলেম ফর চিটাগাং ট্রাইবসম্যান, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ২৯শে জুলাই '৮১।
ব্রায়ান এ্যাডস, ম্যাসাকর ফিয়ারড ইন বাংলাদেশ, দি অবজার্ভার, লণ্ডন, ১৫ই মার্চ, ১৯৮১।

থেকে। আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘি-নালা, রুমা ও আলিকদমে তিনটি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার যখন তখন ভারত বিরোধী জিগির ও যুদ্ধের হুমকি দিলেও, এই জেলার সীমান্ত রক্ষা এবং এখান থেকে আক্রমণ হানতে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করে নি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পঁচিশ বছরের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট কেন তৈরি করা হল, উপজাতিদের এই প্রশ্নের সদুত্তর সরকার দিতে পারেন নি। তবে অনেকের মতে ভারতের মিজো বিদ্রোহীদের দমনে ভারতকে সহযোগিতা করার জন্য এই তিনটি ক্যান্টনমেন্ট খোলা হয়েছিল। কিন্তু উপজাতি জনগণের একটা অংশ ক্যান্টনমেন্ট তৈরির পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায়। তাদের যুক্তি, শত্রু ভাবাপন্ন দেশের আগ্রাসন নীতির হাত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা করতে যদি পাকিস্তান কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে নি, সেই ক্ষেত্রে বন্ধু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখতে কী আওয়ামি লিগ সরকারের মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের প্রয়োজন? পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক বাহিনীর একটি গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ক্যান্টনমেন্টের কর্মতৎপরতা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন লড়াই করে অনেক রক্ত ঝরিয়ে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, তার কণ্ঠ আবার রুদ্ধ হয় নিত্যনতুন সামরিক অর্ডিন্যান্সে। জনগণের চলা-বলায় আসে নিয়ন্ত্রণ। কেড়ে নেওয়া হয় মৌলিক অধিকার। যে আদর্শের জন্য ছাত্র যুব জনতা প্রাণ দেয় সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত, সেই আদর্শ জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রনীতি থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সামরিক বাহিনীর স্বার্থান্বেষী একটি চক্র বন্দুকের নল দিয়ে সার্বিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে নিয়ে আসে আর্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবুও সারা দেশে যা ঘটেনি এই জেলায় তাই ঘটল। মিলিটারি অত্যাচারের তীব্রতা বাড়ল। উদ্দেশ্যও ভিন্ন ধরনের। সামরিক সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চলে জনগণের কণ্ঠরোধ করেছিল যাতে বিরোধী কোন শক্তি জনগণের হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

এবং তাদের ক্ষমতায় থাকার রাস্তা যেন বরাবর পরিষ্কার থাকে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠিত মিলিটারি নৃশংস কার্যকলাপের পেছনে উদ্দেশ্য হল, যারা বাংলাদেশের সত্যিকার নাগরিক হিসেবে মর্যাদার জীবন দাবি করছে, তাদের অর্থাৎ উপজাতিদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া।

পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব বা পাল্টা-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ক্যান্টনমেণ্ট তিনটি বড় করা হয়। সৈন্য সংখ্যাও বাড়ান হয় কয়েক গুণ। থানার সংখ্যা বাড়ান হয় বার থেকে আঠারো। গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গাতে বসান হয় সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ ক্যাম্প এবং স্থল ও জলপথে চেকপোষ্ট। গেরিলা দমন প্রশিক্ষণের জন্য মহালছড়িতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ধল্যাছড়িতে নৌ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া বিমান বাহিনীকেও এই এলাকায় সক্রিয় রাখা হয়। প্রেসিডেণ্ট জিয়ার আমলে সৈন্য মোতায়েনের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি পাঁচজন উপজাতির জন্য একজন সৈন্য রাখা হয়েছিল। বস্তুত, পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বৃহৎ মিলিটারি ক্যান্টনমেণ্টে পর্যবসিত করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনী এবং সাহায্যকারী বাহিনী মোতায়েনের পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল[১]...

বাহিনীর নাম	ব্যাটেলিয়ন ডিভিশন	সদস্য সংখ্যা
বাংলাদেশ আর্মি	২৪তম পদাতিক ডিভিশন	২৫,০০০ জন
বাংলাদেশ রাইফেলস	৮ ব্যাটেলিয়ন	১২,০০০ জন
আনসার	২ ব্যাটেলিয়ন	৪,০০০ জন
পুলিশ	৫ ব্যাটেলিয়ন	৬,০০০ জন
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	—	৮০০ জন

১ ও ২। উলফ্ গেং মে, জেনসাইড ইন বাংলাদেশ, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস কেস, ৭-১১ জুলাই অনুষ্ঠিত 'অন মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজের ৭ম ইউরোপিয়ান কনফারেন্সে' পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৮১, লণ্ডন, উলরীচ্ হেন্স, দি সিক্রেট ওয়ার ইন বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ফেলশীপ অফ রিকনসিলিয়েশানের রিপোর্ট, নেদারল্যাণ্ড, অক্টোবর, ১৯৮০, বাংলাদেশ : প্রাণ্ড এথ্নোসাইড অফ্ ন্যাশানাল মাইনরিটিস ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ ডেমোক্রাটিক মুভ-

মিলিটারি অপারেশন সহজতর ও দ্রুততর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পুনর্বাসন ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী নতুন রাস্তা তৈরি করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। বান্দরবন থেকে রুমা। চিরিঙ্গা থেকে আলিকদম। রামগড় থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে দিঘীনালা। চট্টগ্রাম থেকে ফটিকছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি।[২]

বস্তুত, পুরো এলাকা তিন ভাগে ভাগ করে সামরিক কর্তৃপক্ষ গোপনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অপারেশন এলাকা ঘোষণা করেছে। তিনটি ভাগে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলগুলো হল, সাদা, সবুজ ও লাল। সাদা অঞ্চল—আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসন দপ্তরের দুই মাইলের মধ্যবর্তী উপজাতি ও অনুপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সাদা বা নিরপেক্ষ অঞ্চল।

সবুজ অঞ্চল—শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকাগুলো সবুজ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত।

লাল অঞ্চল—উপজাতি অধ্যুষিত গভীর অরণ্যাঞ্চল। এই সব এলাকা লাল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে সামরিক তৎপরতা চালানো হয়।[১]

সামরিক সরকারের উপজাতি নির্মূল করার জন্য নীতি পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল সাতাত্তরের ছাব্বিশে ডিসেম্বর সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত খাগড়াছড়ি জনসভায়। কয়েক হাজার উপজাতিকে বন্দুকের নলের মুখে জনসভায় হাজির করা হয়। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল মঞ্জুর জনসভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যাদেরকে এ জেলায় পুনর্বাসিত করা হচ্ছে, তারা গরীব এবং ভূমিহীন। এই এলাকার জনসাধারণকে তাদের আশ্রয় দিতে হবে।' উপজাতিরা যদি এই পুনর্বাসন পরিকল্পনায় সহযোগিতা না করে, তবে তার পরিণতি কী হবে, তা বোঝাতে গিয়ে বক্তৃতার এক পর্যায়ে উপজাতিদের হুশিয়ারি দিয়ে মেঃ জেনারেল মঞ্জুর বলেন, 'আমরা তোমাদের

মেন্টের আবেদন, ২৫শে এপ্রিল, ৮৩, লণ্ডন, বাংলাদেশ: রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দি চিটাগাং হিল ট্রাক্ট্স এ্যাণ্ড এ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্যাশানাল কনসার্ণ, এ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্যাশনাল রিপোর্ট, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮০।

১। দি ল্যাণ্ড প্রবলেম অফ হিল ট্রাইবেলস্, ন্যাশানাল কমিশন ফর জাস্টিস এ্যাণ্ড পীস্, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

চাই না। তোমরা যেখানে খুশি চলে যেতে পার। আমরা তোমদের মাটি চাই।'[১] মেজর জেনারেল মঞ্জুরের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় একাত্তরের দুঃসহ নারকীয় দিনগুলো এবং এক হানাদার জেনারেলের উদ্ধত আচরণের কথা। একাত্তরে লাখো লাখো নিরীহ শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মনে করেছিল বাংলাকে চির পদানত রাখা যাবে। রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে হানাদাররা বাংলাকে পবিত্র করতে চেয়েছিল। সেই সময় এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাতকারে এক হানাদার জেনারেল বলেছিল, বিচ্ছিন্নতাব হুমকি থেকে রক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য পবিত্র করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেই জন্য যদি কুড়ি লাখ লোক হত্যা করতে হয় এবং প্রদেশটাকে তিরিশ বছরের জন্য উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতে হয় তবুও—কুমিল্লাস্থ ১৬নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে উদ্ধতভাবে আমাকে একথা বলা হয়।'[২] এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল মানুষ নয়, মাটি। মেজর জেনারেল মঞ্জুর স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর সেনানায়ক। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সদম্ভ ঘোষণা এবং নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তির কাল হাত ভেঙে দেওয়ার লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয় এবং অবদান কৃতিত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পাবত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা এক নয়। প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। কিন্তু পাকিস্তানী জেনারেল ও মেজর জেনারেল মঞ্জুরের সুর অনেকটাই অভিন্ন। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সেনানায়ক মানবতার ঘৃণ্যতম শত্রুদের পরাস্ত করেন, মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে তিনিই এমন ঘোষণা করেছিলেন, যা ইয়াহিয়ার সেনানায়কদের মানায়।

অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচারী মিলিটারি অপারেশনের ফলে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়। লুণ্ঠিত হচ্ছে মানবাধিকার। ব্যাপক গণহত্যা, বিনা বিচারে আটক, ধর্ষণ, জীবন ধারণের আবশ্যিক দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তরণে নিষেধাজ্ঞা, ধর্মবিশ্বাসের জন্য হয়রানি, বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস এবং

১। অগ্গবংশ মহাথের, স্টপ জেনোসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃঃ ১৫।

২। এ্যান্টনি ম্যাসকারেন্স, রেপ্ অফ্ বাংলাদেশ, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লি, ১৯৭৩, পৃঃ ১১৭।

কলুষিত করে দেওয়া, উপজাতি গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে পরিণত করা প্রায় রোজকার ঘটনায় দাঁড়িয়েছে।

আশির পঁচিশে মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের কলমপতি ইউনিয়নে সামরিক বাহিনীর একটি দল নৃশংসতার চরম নজীর রাখে। দিনটি ছিল হাটবার। স্থানীয় মিলিটারি কমাণ্ডার হাটে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দেয় যে, পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দির মেরামত করা হবে। তাই উপজাতি বৌদ্ধরা যেন পোয়াপাড়া বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে অনতিবিলম্বে হাজির হয়। পবিত্র মন্দির মেরামত করতে সোৎসাহে উপজাতি বৌদ্ধরা এগিয়ে আসে। মন্দির মেরামতের কাজে অংশগ্রহণে আসা সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হলে স্থানীয় মিলিটারি কমাণ্ডার তাদের উপর গুলি ছুঁড়তে নির্দেশ দেয়। স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ারের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিমিষে মারা যায় শতাধিক সরলবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ উপজাতি। পোয়াপাড়া বাজার চৌধুরী কুমুদবিকাশ তালুকদার ও স্থানীয় স্কুল কমিটির সেক্রেটারি কার্শীদেব চাকমাও নিহতদের মধ্যে ছিলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে গণহত্যায় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে উপজাতিদের গ্রামে। তারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে। পোয়াপাড়া বৌদ্ধমন্দিরে গণহত্যার অব্যবহিত পর মিলিটারির প্ররোচনায় একদল শরণার্থী উপজাতি গ্রামগুলো লুঠ করতে শুরু করে। কাউখালি, মুখপাড়া এবং হেডম্যান পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। তাদের আক্রমণে মারা যায় অনেক নিরীহ উপজাতি। আরও নয়টি বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করা হয়। পেটানো হয় কুড়িজন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে। আশির বাইশে এপ্রিল বিরোধী দলের তিন সংসদ সদস্য শাজাহান সিরাজ (জাসদ), উপেন্দ্রলাল চাকমা (জাসদ) ও রাশেদ খান মেনন (ওয়ার্কার্স পার্টি) ঘটনা সরজমিনে তদন্ত করতে কলমপতি যান। পঁচিশে এপ্রিল ঢাকা ফিরে এসে তাঁরা এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জানান, নৃশংস ঘটনাবলীর খবর সম্পূর্ণ সত্য। পঁচিশে মার্চের মিলিটারি সংগঠিত গণহত্যায় কমপক্ষে তিনশ উপজাতি নিহত ও সহস্রাধিক নিখোঁজ হয়েছে। গণহত্যায় নিহত উপজাতিদের গণসমাধিও তাঁরা পরিদর্শন করেন। কলমপতি হত্যাকাণ্ড একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সংঘটিত বাঙালী নিধন যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা বলেন—এই হত্যাকাণ্ড বাঙালী জাতির লজ্জা, কলঙ্ক। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে নির্যাতন ও জমি দখলের ঘটনাও তারা উল্লেখ করেন। সরকারের অসত্য ও পাশ কাটানো বিবৃতিতে তাঁরা

বিস্ময় প্রকাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরা সরকারের নিকট উপজাতিদের ক্ষুদ্র জাতি সত্তা মেনে নিতে এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। এই লক্ষ্যে তাঁরা সরকারকে দুটি পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করেন—

এক, অবিলম্বে মিলিটারী অপারেশন বন্ধ করে সত্যিকার অর্থে অসামরিক প্রশাসন প্রবর্তন।

দুই, অবিলম্বে উপজাতি নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে সংলাপ শুরু করা।

একই সাথে কলমপতি ইউনিয়নে সংগঠিত ঘৃণ্য ও দুঃখজনক ঘটনার প্রতিকার হিসাবে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা সরকারের কাছে দাবি জানান।

এক, পঁচিশে মার্চ কলমপতি ইউনিয়নে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, বিচার ও শ্বেতপত্র প্রকাশ।

দুই, দুঃস্থ উপজাতি পরিবারগুলোর যথাযথ নিরাপত্তা সহকারে পুনর্বাসন।

তিন, বিধ্বস্ত বৌদ্ধ মন্দির পুনর্গঠন।

চার, বিভিন্ন জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ।

পাঁচ, শরণার্থীদের অনতি বিলম্বে ফিরিয়ে নেওয়া।

ছয়, বাজারে অবাধ বেচাকেনা ও পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

সংসদ সদস্যরা আরও উল্লেখ করেন যে, দেশের কোথাও জরুরী অবস্থা জারি হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামেও না। তাঁরা সরকারকে প্রশ্ন করেন, কোন বৈধ অধিকারে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঘোষিত যুদ্ধ চালাতে সরকার বিপুল সংখ্যক মিলিটারি মোতায়েন করেছে।[১]

মিলিটারি গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিন সংসদ সদস্যের ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে মিলিটারি বর্বরতা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক অর্থে ঐতিহাসিক। কলমপতি গণহত্যার আগে সংগঠিতভাবে সরকারি বা বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপজাতিদের দুঃস্থ অবস্থা দেখতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেননি। দেশের অন্যান্য জেলায় পুলিশি অত্যাচার, মিলিটারি বর্বরতা এবং প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন জাতীয়

১। তিন সংসদ সদস্য শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমার সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০।

নেতৃবৃন্দ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তার চেয়ে বড় ঘটনা ঘটলেও অজ্ঞাত কারণে তা জাতীয় নেতারা খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তিন সংসদ সদস্যের কলমপতি গণহত্যা তদন্ত করতে যাওয়ায় উপজাতিদের মনে সাময়িকভাবে হলেও হৃত মনোবল ফিরে এসেছিল। তারা আশ্বস্তও হয়েছিল দেশের সচেতন ও বিবেকবান মানুষ তাদের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার সাথী। এই অনুভূতি জাগাতে পারার মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিন সরকারী বৈষম্যনীতি, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এক শ্রেণী লোকের বৈরিতা ও শোষণে মানবেতর জীবনযাপন করা উপজাতিদের মনে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়েছিল যে, তারা একা। সংসদ সদস্যরা এই অমূলক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও ভয় কিছুটা দূর করতে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায়, যেখানে মিলিটারি ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, যেখানে গেলে গুলি করা হবে বলে শাসানো হয়েছিল, সংসদ সদস্যদের হাত ধরে সেই জায়গাগুলোতে যেতে তারা ভয় পায়নি।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, জাতীয় মূলধারা থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উপজাতিরা কলমপতি গণহত্যার পর যে ধরণের সাড়া জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল, তা তারা পায়নি। ধর্মীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী মুসলিম লিগের সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীও ঘটনাস্থলে গিয়ে গণহত্যার তীব্র নিন্দা ও খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইলেন, কিন্তু প্রগতিশীল, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সর্ববৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামি লিগ নিজস্ব সংসদ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পাঠাতে পারেনি। জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি এবং মুসলিম লিগের একটি অংশ যে ধরণের উদ্যোগ নিয়েছিল, তার চেয়ে বড় ভূমিকা উপজাতি জনগণ আশা করেছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন আওয়ামি লিগের কাছ থেকে। অথচ তিনটি বিরোধীদলের সমপরিমাণ ভূমিকাও আওয়ামি লিগ নেয়নি।

সংসদে কলমপতি গণহত্যার তদন্ত চাইল না। ঘটনার নিন্দা করে সাদামাটা একটা বিবৃতি দিল শুধু। তিনটি বিরোধী দলের সমান ভূমিকা যদি আওয়ামি লিগ নিত, তাহলে কলমপতি ইউনিয়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে যে শুভক্রিয়া হয়েছিল, তা আরও ব্যাপক, গভীর ও স্থায়ী হত। উপজাতিদের দুর্ভাগ্য, জাতীয় মূলধারার সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে ওঠার মত সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পরও অধিকাংশ জাতীয় দল তার যথার্থ গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে, দেশের অন্যতম প্রধান দুটো প্রগতিশীল রাজনৈতিক

দল ন্যাপ ও সি. পি. বি'র নীরব ভূমিকা। কলমপতি গণহত্যার তদন্ত ও বিচার দাবিতে এই দুটি দলের জোরালো ভূমিকা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে দল দু'টি।

সংসদের ভেতরে এবং বাইরে কলমপতি গণহত্যা নিয়ে সোরগোল ওঠার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া এই হত্যাকাণ্ড কেন হল, তা তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটিতে বিরোধীদল কিংবা উপজাতি নেতাদের নেওয়া হয়নি। বলাবাহুল্য, তদন্ত কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ করেনি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সামরিক ব্যক্তিদেরও কোন বিচার হয়নি।

আশির ডিসেম্বরে জিয়া সরকার সংসদে 'দুর্গত এলাকা বিল উনিশ শ আশি' পাশ করিয়ে নেয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও গণহত্যা চালানোর বৈধ রাস্তা তৈরী হয়। এই আইন অনুসারে পুলিশের সাব ইনসপেক্টর বা মিলিটারির এন, সি, ও (নন-কমিশন অফিসার) যে কোন ব্যক্তিকে বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার কিংবা গুলি করার নির্দেশ দিতে পারবে। এই আইনের ক্ষমতা বলে নেওয়া কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না। পুলিশ এবং মিলিটারি যে কোন বাড়ীতে তল্লাসী চালাতে পারবে। অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয় সন্দেহে যে কোন বাড়ি পোড়াতে এবং জমি ক্রোক করতে পারবে। বিরোধী সংসদ সদস্যরা এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। সরকার স্বীকারও করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড দমন করতে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে। সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা সরকারি বক্তব্যের উপর মন্তব্য করে বলেন, 'ঝুলির বেড়াল বেড়িয়ে পড়েছে। এটা এখন পরিষ্কার যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সমূহের সমস্যার সমাধান গণহত্যার মাধ্যমেই করতে চায়।'[১]

১৯৮১ সালের ২৮শে এপ্রিল, দুর্গত এলাকা বিলের ওপর লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'that the army and Police would be immune from challenge in the Courts and could enter any premises without warrant. For the Paramilitary opposition the Act was seen as sanctioning violation of human rights. Such legislation is indeed extraordinary since even ligislation

১। আতিকুল আলম, বাংলাদেশ শ্যুট অন সাইট বিল, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮১।

enacted in war time, such as the Defence of India Rules passed during the second world war or the Defence of Pakistan Rules promulgated during 1965 do not provide such powers of shooting to kill as are provided under the proposed Disturbed Areas Act '

সরকার যে তাই চায়, তার প্রমাণ মিলে একাশির ২৬শে জুন। এই দিন মিলিটারি ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর সদ্য পুনর্বাসিত এগার মাইল বিস্তৃত উপজাতি এলাকায় দাঙ্গা লাগায়। তিনদিন ব্যাপী চলে নারকীয় উৎসব। পুড়ে ছাই হয় বনবাই বাড়ি, বেলতলি ও বেলজড়ি গ্রাম। মারা যায় পাঁচশ নির্দোষ নিরীহ নিরস্ত্র উপজাতি নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ। হাজার হাজার গৃহহীন উপজাতির অধিকাংশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বাকিরা পালিয়ে যায় গভীর অরণ্যাঞ্চলে। পুনর্বাসিত শরণার্থীরা দখল করে নেয় উপজাতিদের জমি। একই সালে উনিশে সেপ্টেম্বর মিলিটারি, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও পুনর্বাসিত শরণার্থীরা একাংশ সম্মিলিতভাবে খাগড়াছড়ি মহকুমার ফেনী উপত্যকার পঁয়ত্রিশটি উপজাতি গ্রামে হামলা চালায়। অসহায় উপজাতি নিহত হয় হাজারের উপর। প্রাণভয়ে হাজার হাজার উপজাতি আশ্রয় নেয় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। শরণার্থী (রিফিউজি) ক্যাম্পে কলেরা ও আমাশয় রোগে মারা যায় আরও কয়েকশত শিশু। ভারত সরকার শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে জিয়া সরকারকে অনুরোধ করে। প্রতিবারের মত এবারও সরকার ভারতে শরণার্থী যাওয়ার কথা অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপজাতি জনগণের উপর নৃশংস অত্যাচারের খবরের সত্যতা অস্বীকার করে প্রতিবাদ জানায় সাত্তার সরকার। অবশেষে সংবাদপত্র, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সংস্থা, দেশ ও বিদেশের বিবেকমান জনগণের চাপে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দেশে ফিরিয়ে আনে আঠার হাজার শরণার্থী। সীমান্ত পার হওয়ার পর সরকারী কর্মচারীরা উপজাতি পরিবার পিছু আট মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা দিয়ে উপজাতিদের ছেড়ে দেয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে। নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাদের জমি জবরদখল হয়ে গেছে। বর্তমানে হাজার হাজার ছিন্নমূল উপজাতি অনাহারে, অসুখে, সরকারি যন্ত্রের অনবরত হয়রাণিতে নরকযন্ত্রণায় জর্জরিত।[১]

১। থিন্ ফিফটি বাংলা ট্রাইবেলস কট্ ট্রাইং টু এন্টার ত্রিপুরা, দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ২৯শে জুন, ১৯৮১।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে মিলিটারি অপারেশন এবং জমি জমার দখলের ফলে গভীর অরণ্যাঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া হাজার উপজাতি পরিবার গাছের শেকড় এবং লতাপাতা খেয়ে মানবেতর জীবন যাপন। করছে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন শহর এলাকার বাইরে অত্যাবশকীয় পণ্য যেমন চাল, ডাল, লবন, কেরোসিন, কাপড় এবং ঔষধপত্র নেওয়ার উপর সামরিক কর্তৃপক্ষ কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পরিবার পিছু প্রতি সপ্তাহে দুই কিলোর বেশি চাল গ্রামের উপজাতিরা কিনতে পারে না। সাধারণতঃ একটি পরিবার ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। নির্ধারিত চাল পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব প্রকট। বাজার থেকে ঔষধপত্র কিনে গ্রামে নেওয়ার জন্য বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। উপজাতিদের বেশ কয়েক মাইল হেঁটে সরকারি অফিস হতে এই পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। পার হতে হয় সরকারি অফিসে যেতে তাদের অনেকগুলো পুলিশ এবং মিলিটারি চেক্ পোষ্ট। চেক্ পোষ্টগুলোতে পুলিশ ও মিলিটারিরা উপজাতিদের দারুণভাবে নাজেহাল করে। শুধু হয়রানি নয়, তাদেরকে অনেক সময় আট্‌কে রাখে। জল কিংবা খাবার দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দৈনন্দিন অত্যাবশকীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা থেকে উপজাতিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। ঔষধের অভাবে গ্রামাঞ্চলে মহামারী আকারে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরাতে শরণার্থী বাড়ছে, আনন্দবাজার, ৩০শে জুন, ৮১, রিফিউজি ইনফ্লাক্স ইন ত্রিপুরা, অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে জুন, ৮১, এণ্ড ট্রাইবাল ইনফ্লাকস বাংলা টোলড, দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ৩রা জুলাই, ১৯৮১।

ট্রাইবাল ম্যাসাকার ইন চিটাগাং, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ই জুলাই, ৮১, ষ্টির এ্যাগেনষ্ট বাংলা একজেকিউসান, দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ৮১।

বাংলা হিল্ এরিয়া ডেথ রোল ৫০০ নো ইণ্ডিয়ান হেল্ড ইন বাংলা ইনসিডেণ্ট, দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।
মোর ইনফ্লাকস অব ট্রাইবেলস, দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ৮১।

এই সব দেখে মনে হয়, সকল প্রকার অমানবিক প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জন-গোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সামরিক সরকার বদ্ধ পরিকর।[১]

সরকারি একরোখা নীতির সাথে তাল রেখে উপজাতিদের ভাগ্যও যেন বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সরকার যখন তার উপজাতি নীতি পুর্নমূল্যায়ন ও রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে উপজাতি সমস্যা মীমাংসার পথ খুঁজছে, সারা দেশের রাজনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে তখন। পঁচাত্তরের পনের আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে জাতীয় রাজনীতি ডুবে গিয়েছিল অস্থিতিশীল ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়া স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিছুটা সফলও হন। সীমিত আকারে হলেও তাঁর আমলে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। জিয়া মারা যাবার কয়েকমাস আগে তার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মনে হয়, আমরা ভুল পথে চলেছি। আমরা উপজাতিদের প্রতি অন্যায় করছি, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পুলিশ ও মিলিটারির অপারেশন দিয়ে করতে চাইছি। রাজনৈতিকভাবে বোধ হয় এই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। উপজাতিদের জমি কেড়ে নিয়ে তাদের কোণঠাসা করার সঠিক যুক্তি আমাদের নেই, অনন্তপক্ষে আমাদের উচিত উপজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করে জেনে নেওয়া, তারা কি চায়।[২] প্রেসিডেন্ট জিয়াও হয়ত উপজাতি সমস্যা নিরসনে অস্ত্রের বিকল্প কোন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। জিয়া উপজাতি নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে শান্তি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার

১। ম্যালেরিয়া ডেথস, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৯শে এপ্রিল, দিল্লি ৮১, ম্যালেরিয়া ভিকটিমস, দি টাইমস, ৩রা অক্টোবর, লণ্ডন, ১৯৮৩, ম্যালেরিয়া ডেথস, দি গার্ডিয়ান, ৩রা অক্টোবর, লণ্ডন, ১৯৮৩, সদানন্দ কে দত্ত রায়, চিটাগাং বুদ্ধিস্ট ফিয়ার ডেথ ইন দি জংগল, দি অবজার্ভার, লণ্ডন, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮০। রবিন লাসটিগ, ট্রাইবস ফেস জেনসাইড,দি অবজার্ভার, লণ্ডন, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮০, প্যাট্রিক কীটলী, জেনসাইড পলিসি এ্যালেজড ইন বাংলাদেশ, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০।

২। পিটার নিসওয়ান্ড, দি গার্ডিয়ান, ২৯শে জুলাই, ১৯৮১ লণ্ডন।

প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আলোচনা কি ভিত্তিতে হবে, তা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সংলাপ বিনিময় হচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে জিয়া নিহত হন। সৃষ্টি হয় আর একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। জিয়ার অনুগত সৈন্যরা চট্টগ্রামের সামরিক অভ্যুত্থান দমনে সফল হয়। ঘটনার অব্যবহিত পর রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ পূরণ করতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দল বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টির বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উপজাতি জনগণ আশ্বস্ত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে প্রস্তাবিত আলোচনা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু হল না। হল আবার একটি সামরিক অভ্যুত্থান। আবার সেই খাড়া বড়ি থোর, থোর বড়ি খাড়া। ক্ষমতার পালা বদল আর জনগণের দুর্দশাবৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ফিরে আসতে এক পা এগোয়, তিন পা পিছোয়।

স্বাভাবিক জীবনের মত রাজনীতিতেও হত্যার অনুপ্রবেশ নিন্দার্হ। নিরস্ত্র সাধারণ অনুপজাতি শরণার্থী গ্রামগুলোতে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা চরম নিন্দনীয়, তেমনি সমভাবে নিন্দনীয় মিলিটারির দেওয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একশ্রেণীর শরণার্থীর নিরীহ উপজাতি গ্রামগুলোতে নৃশংস আক্রমণ চালানো। সামরিক সরকার যেমন সমস্যা সমাধানে খোলামেলা আলোচনার চাইতে অস্ত্রের উপর বেশী জোর দিয়েছে, তেমনি শান্তি বাহিনীকেও ঠেলে দিয়েছে উত্তরোত্তর অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে। শান্তি বাহিনী কোন সময় সামরিক ছাউনিতে, ইদানীং বেশি সময় শরণার্থী গ্রামগুলোতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ফিয়ে যাচ্ছে তাদের গোপন ঘাঁটিতে। সামরিক বাহিনী পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে একশ্রেণীর শরণার্থীদের দিয়ে উপজাতি গ্রামে চালাচ্ছে সশস্ত্র আক্রমণ। এতে মারা যাচ্ছে উভয় সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র নিরীহ শত শত মানুষ। শান্তি বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর ভুলের জন্য এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়ের ঘৃণা, অবিশ্বাস দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন সরকারের উপর্যপুরি ভুলনীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা বর্তমানের নাজুক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এম, কিউ, জামানের ভাষায়, 'given the freshness and intensity of the struggle for her own antonomy, right to self-ruler, right to educate in her own language and right to free herself from domination by outsiders, it is striking that successive political regime in

Bangladesh has proved to be less responsive in some of those areas in case of tribal ethnic minorities'.[1]

এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনবিন্যাসের দিকে তাকানো যাক। জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সাতচল্লিশ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপজাতির সংখ্যা ছিল ২%। একাত্তরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯%। সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুর্ণবাসন দেওয়ার ফলে জেলার জনসংখ্যার পুর্ণবিন্যাস কি দাঁড়িয়েছে, তা নিম্নের পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাবে।

সারণী—১

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান (হাজারে)

পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশ								
১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১
২৮৯২৮	৩১৫৫৫	৩৩২৫৫	৩৫৬০২	৪১৯৩১	৪১৯৩০	৫০৮৪০	৭১৪৭৯	৮ ০৫২

পার্বত্য চট্টগ্রাম								
১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১
১২৫	১৫৪	১৭৩	২১৩	২৪৭	২৮৮	৩৮৫	৫০৮	৭৪৬

সারণী—২

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও অনুপজাতির জনসংখ্যার হিসব-

	১৯৭৪	১৯৮১
উপজাতি	৩,৫১,৪৩৩	৩,৯৯,৯৯৯
অনুপজাতি	১,৫৬,৫৬৭	৩,৪৬,০০১
মোট	৫,০৮,০০০	৭,৪৬,০০০

সূত্র—1980 and 1981 statistical year Book of Bangladesh (A Government of Bangladesh publication), Dhaka.

1. *M.Q. Zaman, tribal survival in the chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Man in India, vol.* 64 *(4)- page—78.*

অধিকাংশ উপজাতি বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান নির্ভুল নয়। পরিসংখ্যানে শরণার্থীদের সংখ্যা কম দেখানো হয়েছে। যেমন কম দেখানো হয়েছে উপজাতিদেরও। তাঁদের অভিযোগ, কয়েক হাজার উপজাতি পরিবার বাধ্য হয়ে নিজেদের বাস্তুভিটা ছেড়ে দেবার পরেই এই পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। তদুপরি ইচ্ছাকৃত ভাবেও বাদ দেওয়া হয়েছে উপজাতি জনসংখ্যার একটা অংশকে। তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে জরীপ চালিয়ে উপজাতি জনসংখ্যার একটা পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন এবং তাতে দাবি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতির সংখ্যা প্রায় ছ' লাখ। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, পরিসংখ্যানে যে সব উপজাতি বাদ পড়েছে, তাদের তালিকাভুক্ত করা ও যারা প্রাণভয়ে গভীর অরণ্যাঞ্চলে পালিয়ে আছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছে, তাদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ফিরিয়ে আনা। কত লোককে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে, তারও সঠিক পরিসংখ্যান তাঁরা সরকারের কাছে দাবি করেন। তাঁদের মতে পুনর্বাসিতদের সংখ্যা ৭ থেকে ৮ লক্ষ।

উপজাতিদের তৈরী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল।

সারণী—৩

১৩টি সম্প্রদায়	ধর্ম	জনসংখ্যা
চাকমা	বৌদ্ধ	৩,৫০,০০০
মারমা	বৌদ্ধ	১,৪ ,০০০
ত্রিপুরা	হিন্দু	৬০,০০০
তঞ্চঙ্গ্যা	বৌদ্ধ	৫,০০০
ম্রো	প্রকৃতি-পূজারী	৩৫,০০০
রিয়াং	প্রকৃতি-পূজারী	
খুমি	প্রকৃতি-পূজারী	
চাক	বৌদ্ধ	
মুরুং	প্রকৃতি-পূজারী	
রিয়াং	বৌদ্ধ	
বনযোগী	প্রকৃতি-পূজারী	
পাংকো	প্রকৃতি-পূজারী	
লুসাই	খ্রীষ্টান	
	মোট	৫ ৯০ ০০০

(৩৫,০০০ is bracketed jointly for ম্রো through লুসাই.)

১৯০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ১,২৫০০০। ১৯৫১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৮৮,০০০। অর্থাৎ বছরে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১,৫৩,০০০। অথচ ১৯৮১তে জেলার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৪৬,০০০। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১— এই তিরিশ বছরে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে ৪,৫৮,০০০। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৫৯। সেই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ স'ল, এই তিরিশ বছরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০৭। তাই দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিন দফায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, এই ভিত্তি.তে কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাজ শেষ হয়েছে ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি। তৃতীয় দফায় পুনর্বাসন কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ১৯৮৩ সালের মধ্যে। কতজনকে পুনর্বাসন করা হল, তার খতিয়ান সরকারিভ'বে এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পূর্বোল্লিখিত সারণী দুটতে সরকারি উদ্যোগে অনুপজাতি পুনর্বাসন বৃদ্ধির জ্যামিতিক হার দেখে অনেক উপজাতি নেতা অনুমান করছেন যে, তাঁরা নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাবেন। মর্যাদাপূর্ণ জীবনের দাবি জানিয়ে তাঁদের যে কণ্ঠস্বর এক সময় জোরালো ছিল তা একসময় ক্ষীণ হতে হতে হারিয়ে যাবে অনস্তিত্বের অতলান্তে।

তাহলে কী পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপজাতি অনভিপ্রেত? এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীতের দিকে তাকালে। মোঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলে সমতলবাসীদের প্রবেশ শুরু হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করার পর এই জেলাকে নন-রেগুলেটেড এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে। নন-রেগুলেটেড জেলা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জমির মালিকানা ছিল না। তাদের সামাজিক ও জীবন ধারার নিজস্ব ঢঙে তারা যেখানে সুবিধা চাষ করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হয়েছিল শুধু মাত্র রেগুলেটেড জেলাগুলিতে। সারা দেশের আইন-কানুনের গণ্ডির মধ্যে থাকলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সব সময়ই বৃটিশদের তৈরী পৃথক বিধিরও ব্যবস্থা ছিল, যাতে করে উপজাতিরা আধুনিক আইনের সঙ্গে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সার্কেলের সীমানা চিহ্নিত ও তিন রাজার আসন ও মর্যাদা স্থির হওয়ার পর, তিন রাজা নিজ নিজ সার্কেলে কৃষি কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে সমতল এলাকা থেকে অনুপজাতি চাষী নিয়ে আসতেন। কারণ

উপজাতিরা সমতল ভূমির চাষ ভাল বুঝত না। তদুপরি সমতল এলাকা থেকে আনা চাষীরা ছিল ভীষণ পরিশ্রমী। অভিজ্ঞতা এবং পরিশ্রম মিলে উৎপাদন হত ভাল। সাধারণত প্রতিবেশী জেলা চট্টগ্রাম ও নোওয়াখালি থেকে এই ধরণের চাষীদের আনা হত। তারা বাড়ি করার মত জায়গা পেত। অনেক সময় উপজাতিদের জমি, দীর্ঘদিন যে জমিতে উপজাতিরা চাষ করেছে, তারা বর্গাপ্রথায় চাষ করত। রাজাদের কাছ থেকে তারা, কোন কোন ক্ষেত্রে, নিজেরাও চাষ করার জন্য জমির মঞ্জুরি পেত। মালিকানা স্বত্ব না থাকাতে রাজারা ইচ্ছে করলে তাদের তুলে দিতে পারতেন। বিভিন্ন সময়ে চাষবাসে সাহায্য করার জন্য সমতল এলাকার চাষীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আসাটা উপজাতিদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। বৃটিশ শাসনকালেও চাকরি বা ব্যবসার কাজে অনেক অনুপজাতি এই এলাকায় আসতেন। কিছু পরিবার আবার স্থায়ী ভাবে বসবাস করার উদ্দেশে এই জেলায় থেকে যেতেন। নন-রেগুলেটেড জেলা হওয়াতে বহিরাগত অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন, এমন কেউ এই জেলায় জমি কিনতে পারতেন না। কিন্তু বসবাস করার মত ভিটেমাটির মঞ্জুরি তাঁরা পেতেন। কেউ আবার অনুমতি না নিয়েও ঘরবাড়ি তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। পাকিস্তান আমলেও এই প্রক্রিয়ায় অনেক সমতলবাসী অনুপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তখন তাদের সঙ্গে উপজাতিদের কোন সংঘাত বাঁধেনি। সৌহার্দ্য-পূর্ণ পরিবেশও তাই বজায় ছিল। সংঘাত বাঁধে বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপকহারে লোক এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন, উপজাতিদের ভাষায় অনুপ্রবেশ শুরু হয় যখন।

দীর্ঘদিনের বিবর্তন ও আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উপজাতিরাও সরকারের কাছ থেকে নিজ নিজ জমির সীমানা চিহ্নিত করে মালিকানা স্বত্ব নিয়ে নিয়েছে। উপজাতিদের বিশ্বাস, তারা একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অংশ। তাদের এক সময় বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ, দিগ্বিজয় ও গৃহ বিপ্লবের পরিণামে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস কতটুকু সত্য নির্ভর, তা প্রমাণ করতে প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে। উপজাতিদের মতে, তারা পাঁচশ বছর আগেও বর্তমানের টেকনাফ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত একটি দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম জনগণ ছিল। কালক্রমে তারা বিভিন্ন জাতির কাছে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন।

পিছু হটতে হটতে তাদের পিঠ আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি জেলায় এসে ঠেকেছে। কয়েক শ বছরের অভিজ্ঞতায় তাদের চেতনায় ঘটেছে পরিবর্তন। তারা আর পিছু হটতে রাজী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে তারা মনে করে, তাদের মাতৃভূমির শেষাংশ। তাদের যাবার মত কোন জায়গা আর নেই। মাতৃভূমির শেষাংশ যে কোন মূল্যে তারা আঁকড়ে থাকতে চায়। সেই শেষ বিন্দুতেও যখন, তাদের ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়, তখন উপজাতিরা স্বাভাবিক কারণে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পালাবদলে বিভিন্ন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও, যে দেশের নাগরিক, সেই দেশের সরকার যেমন তাদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকেরও মর্য্যাদা দেয় নি, তেমনি উপজাতিরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের অন্য কোন অংশ তাদের মাতৃভূমি বলে মানতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই দেখা যায়, স্থায়ীভাবে বসবাস দূরের কথা, কর্মক্ষেত্রেও যদি উপজাতিদের ভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়, তাহলে তারা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অসন্তুষ্ট হয়। অবশ্য এই মনোভাব ধীরে ধীরে কাটছে। এমন একটা মানসিকতা গড়ে ওঠার জন্য উপজাতিরা এককভাবে দায়ী নয়। দায়ী বিভিন্ন সরকারের উপজাতি স্বার্থবিরোধী নীতিও।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ, তাদের শেষ আবাস ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য কোন জনগোষ্ঠীর আধিপত্য সহজে মেনে নিতে চায় না। তারা মনে করে, তাদের মাতৃভূমিতে তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার থাকবে। সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে যখন তাদের মনে হয়েছে, তখন তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কেন এই প্রতিবাদ, মানুষ কেন বিদ্রোহ করে, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে টি, আর, গুর তাঁর 'হোয়াই মেন রেবেল' গ্রন্থে লিখেছেন, When an established socio-political order is suddenly put into disorder by any external thrust, resistance is inveitable no matter how simple or complex the society affected might be'.[১]

কথাটা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

১। টি, আর, গুর, হোয়াই মেন রেবেল, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭০, ডি, সি, ডেভিস (সম্পাদিত), হোয়েন মেন রেভল্ট এ্যাণ্ড হোয়াই, লণ্ডন ফ্রি প্রেস, ১৯৭১।

তাই দেখা যায়, উনিশশ বাহাত্তর থেকে আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান সম্ভব কিভাবে, বিভিন্ন সময়ে উপজাতি নেতারা (এমনকি সরকার পক্ষীয় উপজাতি নেতারাও) বিভিন্ন সরকারের কাছে যে দাবি বা সুপারিশ পেশ করেছেন, তন্মধ্যে পুনর্বাসন বন্ধ করা, পুনর্বাসিতদের প্রত্যাহার ও জবরদখলকৃত জমি পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া, এই তিনটি দাবি সবক্ষেত্রেই প্রধান দাবি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক পুনর্বাসনই হচ্ছে উপজাতিদের অসন্তোষের প্রধান কারণ। আর এই অসন্তোষ পুঁজি করে গঠিত হয়েছে কতিপয় উপজাতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনী।

শান্তি বাহিনী

উনিশ শ ছেষট্টির পয়লা মার্চ ভারতের মিজোরামের একদল মিজো বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মিজো ন্যাশানাল ফ্রণ্টের প্রধান লালডেঙ্গা। বিদ্রোহীরা ভারতের পতাকা পুড়িয়ে ফেলে। ভারতের সঙ্গে মিজোরামের সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়। পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর সব চৌকি দখল করে মিজোরামের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। কিন্তু তার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েকদিন। ভারতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে সফল হয়।[১] বিদ্রোহের নেতা এবং বিদ্রোহীরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহীদের শুধু আশ্রয় নয়, গেরিলা যুদ্ধে দক্ষ এবং শিক্ষিত করে তোলার জন্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকটি গোপন প্রশিক্ষণ শিবিরও খুলেছিল।

কুকিদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের বহুযুগ আগে দ্বন্দ্ব এবং সহিংস সংঘর্ষ হয়। চাকমা ছড়া এবং ইতিহাসে কুকিদের সঙ্গে সংঘর্ষের অনেক ঘটনা বিবৃত রয়েছে। কুকি এবং মিজো একই গোত্রভুক্ত। যদিও নামে আলাদা। চাকমারা মনে করে, কুকিরাই পরে মিজো নামে পরিচিত হয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে মিজো এবং চাকমা, দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান কাজে লাগিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় মিজোরা বেশ কয়েকটি চাকমা গ্রামে সশস্ত্র হামলা চালায়। ছেষট্টির পর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘাত বাঁধে। কখনও তা সহিংস রূপ নিয়েছিল। মিজো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্যার প্রকৃতি মূলত এক হলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিজোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। মিজোরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের প্রায়ই বলার চেষ্টা করত যে, আদৌ যদি দেশে ফিরে যেতে না

১। ভি. আই. কে সারিণ, ইণ্ডিয়াস নর্থ ইষ্ট ইজ ইন ফ্লেমস, ভারৎ পাবলিশিং, দিল্লী, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৮।

পারে, তাহলে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি মত পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা পুণর্বাসিত হবে। জাতিগত ভাবে তাদের মত, তিব্বেতো—বর্মী মংগোলীয় বংশোদ্ভূত হওয়া সত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা মিজোদের উপস্থিতি এবং কথাবার্তা ভাল চোখে দেখে নি।

ছেষট্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি জনকল্যাণ পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে।[১] সংগঠনটি গোপন হলেও, দাবি আদায়ে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। একই সালে ভারতের বিদ্রোহী মিজোদের দেখে উপজাতি যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশও অনুরূপ সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনায় এমন একটা চরম মানসিকতা উপজাতি জনগণের একটা অংশের মনে জেগে ওঠা খুব স্বাভাবিক ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা এতটা হতাশজনক ছিল যে, উপজাতিরা জেলার সর্ব স্তরে দেখত, তারা অধঃস্তন এবং অনুপজাতিরা উর্ধ্বতন। মাইরণ ওয়েনার বিশেষ একটা অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে যা বলেছেন, তা পাবত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়, শিক্ষক অনুপজাতি, ছাত্র উপজাতি। ডাক্তার অনুপজাতি, রোগী উপজাতি। উকিল অনুপজাতি, মক্কেল উপজাতি। দোকানদার অনুপজাতি, ক্রেতা উপজাতি। সরকারি কর্মকর্তারা অনুপজাতি, আবেদনকারী উপজাতি। তদুপরি জেলার সরকারি প্রশাসনে নিয়োজিত বড় কর্মকর্তাদের কেউ কেউ সেই মানসিকতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন চালাতেন, যেমনটি করতেন বৃটিশ অফিসাররা বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন জেলাগুলোতে। বিরাট আশা জাগিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও, এই অবস্থার বড় একটা তারতম্য হয়নি।

বিগত কয়েক দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আয় ও পেশাগত মাপকাঠিতে না হলেও শিক্ষা ও চেতনায় উপজাতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। বস্তুগত ভাবে মধ্যবিত্ত হওয়ার অনেক আগে চিন্তা চেতনায় এই শ্রেণী মধ্যবিত্ত হয়েছিল পূর্বেই। এই শ্রেণী সেখানে পৌঁছুতে চাইল, যা এতদিন তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। সাধারণ উপজাতিদেরও তারা সচেতন করা শুরু করে। মূলত, মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী

১। অপরবংশ মহাথের স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, অক্টোবর ৮০, কলকাতা, পৃঃ ১২।

উপজাতিদের বোঝাতে সমর্থ হয় যে, সরকারি উপজাতি নীতির বিরুদ্ধে ও নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সংগঠিতভাবে না লড়লে তাদের চিরদিন ন্যায্য নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। শোষণ ও নিপীড়ন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে। নিজেদের পায়ে শক্তভাবে না দাঁড়ালে তাঁরা একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি জনগণ নতুন প্রেরণা লাভ করে। তারা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন এবং ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে উপজাতি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। উনসত্তর-সত্তরে তারা একজন নেতা পেয়ে যায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে তারা তাদের জীবনের আকাশে পুঞ্জীভূত দুর্দশার কালো মেঘের বদলে আশার সোনালী স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যে ভয়ংকর এক ঝড়ে তছনছ হয়ে যাবে, তা তারা তখনও জানত না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সত্তর সালের ষোলই মে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান রাঙামাটি কোর্ট তখন ছিল নির্মানাধীন। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য নির্মানের কাজ কয়েক মাস পরিত্যক্ত ছিল। নির্মিয়মান কোর্ট বিল্ডিং-এর চারপাশে তখন দুই মানুষ সমান উঁচু ঝোপঝাড়। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর বসেছিল সেই গোপন সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু, অমিয় সেন চাকমা, কালি মাধব চাকমা ও পংকজ দেওয়ান। সেই গোপন সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, তা সংরক্ষণ এবং বিকাশের মাধ্যমে তাদের (উপজাতিদের) অবলুপ্তির থেকে রক্ষা করার লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ও সর্ব শ্রেণীর উপজাতি সম্প্রদায় ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দল গঠিত হবে। যদিও দলের নামকরণ সেই মুহূর্তেই হয়নি তবুও বলা যেতে পারে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' সেই গোপন সভার ফলশ্রুতি। পাঁচজন যুবনেতা যখন এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন, তখন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর স্বাধিকার আন্দোলনের ঝড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসক শোষক গোষ্ঠীর গদী টলটলায়মান। বস্তুতঃ, সারা পাকিস্তান তখন আপামর জনগণের সমর্থন পুষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্দোলনে অশান্ত, উত্তাল হয়ে উঠলেও, সেই জাতীয় আন্দোলনে উপজাতিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মত ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ বা পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, না জাতীয় নেতারা, না উপজাতি নেতারা, কেউ কারো সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ব সম্প্রদায়ের উপজাতিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গড়ার মত উপযুক্ত ক্ষেত্রও পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন ছিল না। সম্ভবতঃ তাই পাঁচ যুব উপজাতি নেতা শুধুমাত্র উপজাতিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করে কোন ঝুঁকি নিতে চান নি। সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি পর্বও গোপন রাখার সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন। এক অর্থে এই পাঁচজনই, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পাঁচজন ছাড়া আর কেউ যেন এই গোপন সভার কথা জানতে না পারে, তার জন্য মন্ত্রগুপ্তি শপথ নেওয়া হয়। মন্ত্রগুপ্তি শপথ পড়ান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

কিন্তু একটি প্রকাশ্য আঞ্চলিক দল গঠনের পূর্বে গোপন তৎপরতা চলাকালীনই উদ্যোক্তরা সংকটের মুখোমুখি হন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে রক্তপিপাসু হায়েনার মত পাঞ্জাবী শাসক শোষক গোষ্ঠীর মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের ওপর। শুরু করে নরহত্যা যজ্ঞ। গণতন্ত্র, ও মানবাধিকার লুণ্ঠনের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাংলার জনগণ। স্বাধিকার অর্জনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রূপ নেয় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের। কেন এবং কি পরিস্থিতিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তাঁর দলবল এই সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্তই বা রাজনৈতিকভাবে কতটুকু সঠিক ব বেঠিক হয়েছিল, তা পূর্বের এক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি পঙ্কজ দেওয়ান, যাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল ভবিষ্যতে যে দল গঠিত হবে, সেই দলের সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার। তিনি বরং মত পোষণ করেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করলে রাজনৈতিকভাবে লাভ হবে। সম্ভবত তাঁর ধরণা ছিল, দারুণ প্রতিকূল অবস্থা সামলে পাকিস্তান তার অখণ্ড অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করলে গৃহযুদ্ধের অবসানে পুরস্কার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহ শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত একটি নিরাপদ ব্যবস্থা পাবে, যা তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার হুমকি থেকে বাঁচাতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন গোপন বৈঠকের অন্য চার নেতা। মতবিরোধের পরিণতি হিসেবে পঙ্কজ দেওয়ান

সি. এ. এফ (সিভিল আর্মড ফোর্সেস)-এর সদস্য হয়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করেন। এই কাজের জন্য অবশ্য তিনি বহিষ্কৃত হন তাঁর চার সঙ্গী দ্বারা।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর পঙ্কজ দেওয়ান স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। তাঁর সঙ্গে অপর চার বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর, তিয়াত্তরে তিনি রাজনীতিতে আবার ফিরে আসার চেষ্টা করেন। এক সময়ের জাঁদরেল ছাত্রনেতা পঙ্কজ দেওয়ান তাঁর কর্মীদের দিয়ে একমাত্র উপজাতি ছাত্রসংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রথমে দখল, পরে ভাঙার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকজনকে নিয়ে তিনি গঠন করান 'পাহাড়ী যুবক সংঘ।' তিনি দলভাঙা, দল গড়ার প্রকাশ্য কাজে আসেন নি। কলকাঠি নেড়েছিলেন নেপথ্যে। পাহাড়ী যুবক সংঘ গড়ার উদ্যোগীদের মধ্যে নির্মল চাকমা, সুনির্মল তালুকদার (বুলবুল) সুশান্ত দেওয়ান (তাতু), চাঁদ রায় (কর্ণ), নিবারণ চাকমা (বড়দা)-র নাম উল্লেখযোগ্য। নির্মল চাকমা সভাপতি ও চাঁদ রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে একটি নামমাত্র কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পাহাড়ী যুবক সংঘ বেশিদিন টেঁকে নি।

উপজাতি ছাত্রদের মূল সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ভাঙার চেষ্টা আর একবার হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা হিমাংশু বিকাশ খীসা (ভুদুং) পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ভেঙে ছাত্র ইউনিয়ন ভাবাদর্শে প্রভাবান্বিত একটি উপজাতি ছাত্র-যুব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিয়াত্তরের শেষে। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও, নিকট আত্মীয় ও ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন উপজাতি ছাত্রকে নিয়ে গঠন করেন 'পাহাড়ী যুব সমিতি।' এই সমিতির অস্তিত্বও কিছুদিন পর বিলুপ্ত হয়। অন্যদিকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রতিটি আঘাত কাটিয়ে দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

গোপন বৈঠকের চার নেতা আরও কয়েকজনকে নিয়ে বাহাত্তরের পনেরই ফেব্রুয়ারী গঠন করেন প্রকাশ্য দল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। বি কে. রোয়াজা সভাপতি ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জন

সংহতি সমিতি গঠন ও জনপ্রিয়তার মূলে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের জাতীয়তাবোধ (Ethnic feelings)। তাই দেখা যায়, সমিতির মূল উদ্যোক্তরা—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সস্তু জাতীয়তাবাদী, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা রুশ ঘেঁষা (তিনি ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপের কর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের (মতিয়া গ্রুপ)-এর কেবিনেটে নির্বাহী সদস্য ছিলেন, ও ভবতোষ দেওয়ান মধ্যপন্থী—ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে প্রভাবান্বিত হলেও একজোট হতে পেরেছিলেন।

বাহাত্তরের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পর্যন্ত সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উপজাতি জনগণের স্বকীয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু উপজাতি জনগণের জন্য কোনপ্রকার শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা আদায়ে তিনি ব্যর্থ হন। জনসংহতি সমিতির অনেক নেতা ও কর্মী তখন মত পোষণ করেন যে, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে। অন্যদিকে, 'মুক্তিযোদ্ধা নামধারী এক শ্রেণীর বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। হত্যা, লুন্ঠন, নারী ধর্ষণ, জমি দখল তারা চালিয়েছে নির্বিবাদে। বারবার জানানো সত্ত্বেও এইসব নৃশংস কর্মকাণ্ড দমনের চেষ্টা সরকারিভাবে করা হয় নি।[১] অধিকন্তু সরকারি উদ্যোগে বাইরের জেলার লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে ঢোকান শুরু হয়। জাতীয় বিরোধী দলগুলো সরকারি নীতির কড়া সমালোচনা করেনি। উপজাতি জনগণ তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে শঙ্কিত হয়। তাদের মনে এই ধারণা জন্মাতে শুরু করে যে, বাঁচার লড়াই তাদেরকেই করতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানের পথ যখন রুদ্ধ হয়, তখন জন্ম নেয় গোপন তৎপরতা। যার অনিবার্য পরিণতি সশস্ত্র কার্যকলাপ। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

উপজাতি জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং জঙ্গী মনোভাব সম্বল করে তিয়াত্তরের সাতই জানুয়ারী গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির

১। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, ৮৪, ঢাকা।

সশস্ত্র শাখা 'শান্তি বাহিনী।' পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামে-গঞ্জে অস্থিরতা, বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে উপজাতি সমাজ জীবনে ভারসাম্য, স্বাভাবিকতা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য এই বাহিনীর জন্ম দেওয়া হয়েছিল বলে বাহিনীর নাম রাখা হয় শান্তি বাহিনী। নামে সঙ্গতি থাকলেও মার্কিনী শান্তি বাহিনী বা পীস কোরের সঙ্গে এই বাহিনীর কর্মে বা উদ্দেশ্যের কোন একাত্মতা নেই।

শান্তি বাহিনী গঠিত হবার পেছনে বাহ্যিক কিছু কারণও আছে। বাংলাদেশ যাতে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে না পাবে, তার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত চীন-মার্কিন-পাকিস্তান আঁতাত নানাভাবে নানাদিক থেকে দেশে বিশৃংখল ও অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। চীন-মার্কিন-পাকিস্তান আঁতাতের মধ্যেকার প্রধানতম শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। চীন তখনও তার প্রচার যন্ত্রে প্রচার করছিল যে, তথাকথিত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লড়াই চলছে। বাংলাদেশ নামে একটি দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। জনসংহতি সমিতির অধিকাংশ নেতা সম্ভবতঃ চীনের উসকানীমূলক অভিসন্ধি ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। তাঁরা হয়ত এই বিরোধীতা ধরে নিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি চীনের পরোক্ষ সমর্থন হিসেবে। অন্যদিকে পাকিস্তান ও তার দোসর মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো তখনও বাংলাদেশকে মুসলিম বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন দেখছিল। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বে ছড়াচ্ছিল গুজব। অপপ্রচার। মুসলিম বাংলার প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম উপজাতিদের কোন দুর্বলতা না থাকলেও, পাকিস্তান জানত, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম সম্প্রদায় চাকমাদের রাজা ত্রিদিব রায়ের প্রতি দুর্বলতা আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া নিষ্ঠুর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুর্বলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ চাকমাদের বিশ্বাস, রাজা ত্রিদিব রায় তাদের সঙ্গে থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যা ঘটেছে, তা হয়ত ঘটত না। চাকমাদের স্পর্শকাতরতা সুচতুরভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। চাকমাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের দিনে পাকিস্তান বেতার রাজা ত্রিদিব রায়ের ভাষণ সম্প্রসারিত করা শুরু করে। লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ দেওয়া এবং জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর পর্যন্ত এই প্ররোচনা অব্যাহত ছিল। তাছাড়া, রাজা ত্রিদিব রায় বার্মার পাকিস্তানের

রাষ্ট্রদূত হয়ে আসছেন বলে একটি গুজব বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, জনসংহতি সমিতির অধিকাংশ নেতা হয়ত মনে করেন যে, এবার আন্তর্জাতিক-ভাবেও তাঁরা সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন।

এই সময় দেশের চীনপন্থী কয়েকটি রাজনৈতিক দল হক-তোহা এবং আলাউদ্দিন-মতিনের কমিউনিস্ট পার্টি, সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি, বাংলা-দেশের স্বাধীনতা অস্বীকার করে। দলগুলোর বক্তব্য, এই স্বাধীনতা অপূর্ণ স্বাধীনতা। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য ভারতের সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। তাই, পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ-জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল ও ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দলগুলো পৃথক পৃথক ভাবে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু কবেছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন যুব ও ছাত্র নেতা সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের নেতৃত্বে জন্ম নিয়েছিল নতুন একটি দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ। এই দলটিও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে গোপনে দলের সশস্ত্র শাখা 'গণবাহিনী' গঠন করে।

আওয়ামি লিগের মধ্যেও এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সশস্ত্র ক্যাডার। দলের কিছু তথাকথিত নেতার শক্তির উৎস ছিল সশস্ত্র ক্যাডার। সশস্ত্র ক্যাডারের সংখ্যা কার কত, তার উপর নির্ভর করত কে বড়, পদমর্যাদা কার বেশি প্রাপ্য। রাজ-নৈতিক পর্যবেক্ষক একটি মহল মনে করেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে এই ধরনের নেতাদের গোপন হাত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেওয়ার জন্যও তাঁরাই দায়ী বলে এই মহলের ধারণা। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং অস্ত্রের রাজনীতির প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম জন-সংহতি সমিতির ওপর পড়াটা স্বাভাবিক। জনসংহতি সমিতি হয়ত ধরে নিয়েছিল যে, দেশে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ আসন্ন। সমিতির প্রধান দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন-আদায়ে তাই প্রয়োজন সশস্ত্র সমর্থন। আর তারই প্রস্তুতির অংগ হিসেবেও হয়ত শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল।

কুড়িয়ে পাওয়া অস্ত্র দিয়েই শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। যে সব পাহাড়ী রাজাকার প্রাণভয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়েছিল, তারাও অস্ত্রসহ

যোগ দেয় শান্তি বাহিনীতে। পুলিশ, বি. ডি. আর ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন পাহাড়ী সৈনিক প্রথম দিকে দায়িত্ব নেয় প্রশিক্ষণের। তিয়াত্তর এবং চুয়াত্তর ছিল রিক্রুটমেন্ট বা দলে টানার বছর।[১] সশস্ত্র কর্মতৎপরতা শুরু করার আগে জনসংহতি সমিতির নেতারা বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে রাখতেন। মূলতঃ শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতি প্রশংসনীয়ভাবে কয়েকটি সমাজ সংস্কার মূলক কাজ বাস্তবায়নে সফল হয়। যেমন, উপজাতিরা বলতে গেলে জন্মগতভাবে জুয়া ও মদে আসক্ত —যা তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংহতি সমিতি গ্রামাঞ্চলে জুয়া খেলা ও অপরিমিত মদ পান বন্ধ করতে সফল হয়। গ্রামের কিছু অংশ থেকে মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করতেও জনসংহতি সমিতি প্রশংসনীয় ভূমিকা নেয়। আমরা নিরস্ত্র নই, প্রয়োজনে অস্ত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করব, এমনটা ব্যবহারিক ভাবে ঘোষণা ও জনমনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে শান্তি বাহিনীকে বেশি কাজে লাগাতে শুরু করে। সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিতে উপজাতি জনগণের একটা অংশ বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন মার খেয়ে এসেছে। প্রয়োজনে পাল্টা মার দিতে তারা এখন সক্ষম, এই আস্থা ও বিশ্বাস তাদের মনে জন্মানোর পর শান্তি বাহিনী উপজাতি জনগণের একটা অংশের আস্থা অনেকটা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শান্তি বাহিনী ক্রমশ জনসংহতি সমিতির শক্তির প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। তিয়াত্তরের সাধারণ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির বিরাট সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব শান্তি বাহিনীর—যদিও বা তখন অভিযোগ উঠেছিল শান্তি বাহিনী বন্দুকের নলের মুখে উপজাতি জনগণকে বাধ্য করেছিল জনসংহতি সমিতির পক্ষে ভোট দিতে—সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিজয় পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অনবদ্য অবদানের চাইতেও বেশি। জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপ ও বক্তব্যেও দেখা গেল পরিবর্তন। সমিতি দিনে দিনে অধিকতর জঙ্গী হয়ে ওঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ছিল গণসংগঠন। উপজাতি জনগণের মুক্তিই দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল। লক্ষ্যে পৌঁছতে ভিত্তি হিসেবে কি আদর্শ বা রণনীতি ও রণকৌশল অনুসরণ করা হবে, তা স্পষ্ট ছিল

১। চিত্তরঞ্জন মুৎসুদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ৮৪, ঢাকা।

না। তাই দেখা যায়, জনসংহতি সমিতির প্রথম সভাপতি বি. কে. রোয়াজা সহ অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর বিশেষ কোন আদর্শের প্রতি ঝোঁক ছিল না। কিন্তু জনসংহতি সমিতি গঠনে যে সংগঠনের সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকরী ভূমিকা ছিল, সেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কিছু শীর্ষ নেতা এবং কর্মী মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত।

পাহাড়ী ছাত্র সমিতি দল নিরপেক্ষ সংগঠন ছিল। জনসংহতি সমিতি গঠিত হবার পর এই ছাত্র সংগঠনটি জনসংহতি সমিতির ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়। পরবর্তীতে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অনেকে আবার সরাসরি শান্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। তন্মধ্যে দু' একজন নেতার উৎসাহে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের আদর্শগতভাবে গড়ে তুলতে মাও-সে-তুং-এর লাল চটি বই বিলি করা হয়। প্রতিক্রিয়াও হয় ব্যাপক। শান্তি বাহিনীর বৃহৎ অংশ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তদের বক্তব্য, আমরা কোন ইজমের অনুপ্রবেশ চাই না। ইজমের অনুপ্রবেশ হলে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। আমরা জাতীয়তাবাদী শক্তি। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সকল উপজাতি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। আদর্শের কোন্দল কেন্দ্র করে শান্তি বাহিনীর কিছু সদস্য চুয়াত্তরের প্রথম দিকে গোপনে গঠন করে 'ট্রাইবেসল পিপল্‌স পার্টি বা টি. পি. পি'। শান্তি বাহিনীর শীর্ষ নেতারা কর্মীদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার পরিণতিতে আরেকটি দল গজিয়ে উঠুক তা নেতারা চান নি। ভবিষ্যতে কোন বিশেষ ইস্যুতে মতবিরোধের ফলে যেন শান্তি বাহিনী ভেঙে না যায় কিংবা শান্তি বাহিনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন নেতা এবং কর্মী নতুন আরেকটি দল গঠন করার প্রশ্রয় না পায়, সেই জন্য শান্তি বাহিনীর নেতারা টি. পি. পি. গঠনের মূল নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেন। টি. পি. পি-র সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে কিছু সদস্যকে দল থেকে ছাঁটাই করাও শুরু করে দেন তাঁরা। যারা বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাদের দলে রাখা হয়। যারা করেনি, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর অবশ্য প্রকাশ্যভাবে মাও-সে-তুং-এর লাল চটি বই বিলি করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এই গোষ্ঠী 'রাঙামাটি কমিউনিস্ট পার্টি' নামে শান্তি বাহিনীর মধ্যে একটি সংগঠন গড়ার গোপন

উদ্যোগ অব্যাহত রাখে।[১] শান্তি বাহিনী প্রথম সাংগঠনিক দ্বন্দ্বের ধাক্কা সামলিয়ে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে শান্তি বাহিনীর নেতাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শান্তি বাহিনীর একটি বক্তব্য—পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এনেক্স, মূল ভূখণ্ড নয়—বাংলাদেশের ঐ কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি মানতে রাজি হয়নি। এতে পার্বত্য এলাকার দাবি আদায়ে কমিউনিস্ট ঐক্যের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।[২]

সির'জ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি তখন জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়ে সশস্ত্র এ্যাকশন কর্মসূচী শুরু করে দিয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে এগিয়ে আসার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, একটি নিরাপদ পকেট তৈরী করা। যেখান থেকে প্রশিক্ষণ এবং সশস্ত্র এ্যাকশন চালানো যাবে। প্রয়োজনে রিট্রিট করে পরবর্তী এ্যাকশনের পরিকল্পনাও নেওয়া যাবে। কোন সমঝোতায় আসতে না পেরে ঐ দলগুলোর কোনটাই পার্বত্য চট্টগ্রামে পকেট সৃষ্টির চেষ্টা করেনি। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিও অনুরূপ-ভাবে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কোন প্রকার সমঝোতায় পৌছতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সর্বহারা পার্টি হাল ছাড়ে নি। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দলে টানার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি ঘোষণা করে, বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।[৩] শিক্ষিত উপজাতি যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ মনে করে যে, উপজাতি জনগণের সার্বিক বিকাশ

১। সূত্র, জনসংহতি সমিতি।

২। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে. '৮৪, ঢাকা।

৩। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ নীতি, নয় নম্বর নীতি, সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন—১, শামীম সিকদার, ঢাকা, পৃঃ—১৬।

সাধনের প্রধান শর্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তা আদায় সম্ভব নয়। প্রয়োজন সশস্ত্র লড়াই। তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে নয়। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং উপজাতিদের অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে যে দল সেই দলে যোগ দিয়ে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো আমূল বদলের মধ্য দিয়ে উপজাতি জনগণের নিরাপত্তা এবং বিকাশ সাধন করতে হবে। সর্বহারা পার্টি সহজে এই শ্রেণীর যুবকদের দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়। তাদের দিয়ে 'মুক্তি পরিষদ' নামে একটি সংগঠন তৈরী করিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে সর্বহারা পার্টি। কয়েকজন উপজাতি বুদ্ধিজীবীও সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। তার ভেতর রাঙামাটি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপক প্রমোদ বিকাশ কার্বারী এবং সুধান্ত তঞ্চঙ্গ্যার নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বহারা পার্টি উপজাতি সদস্যদের দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকটি গোপন ঘাঁটি করতে চাইল।

অন্যদিকে শান্তি বাহিনী চায় না যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য কোন দলের সশস্ত্র তৎপরতা গড়ে উঠুক। ফলে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সর্বহারা পার্টির কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঁধে। তবে শান্তি বাহিনীর সাফল্যের পাল্লা ভারি ছিল। সংঘর্ষে সফলতার ফলশ্রুতিতে শান্তি বাহিনী সর্বহারা পার্টির বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। এতে শান্তি বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার মজবুত হয়। অবশেষে, সর্বহারা পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপন ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রাথমিক বিপর্যয় সফলভাবে কাটিয়ে ওঠার ফলে শান্তি বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তি আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ব্যাপক সশস্ত্র এ্যাকশনে যাওয়ার জন্য শান্তি বাহিনী পার্টির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

শান্তি বাহিনী নিজের স্বার্থে, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও অস্ত্র যোগাড়ের গোপন রাস্তা তৈরী করতে প্রতিবেশী দেশ বার্মার নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালায়। দুই পার্টির মধ্যে মাত্র একবার বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রকার যৌথ কর্মসূচী গৃহীত হয় নি। তবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, একে অন্যকে বিরক্ত করবে না।[১] এই সময়ের মধ্যে

১। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, '৮৪, ঢাকা।

চীন ছিল ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট, আরাকানের বিদ্রোহী দল রাহাইয়ের উভয় গ্রুপ, আরাকান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয়তাবাদী রামলাপার সঙ্গে শান্তি বাহিনীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[১] পরবর্তীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চীনের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেন। প্রথম দিকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৭৭'র শেষের দিকে চীনের সঙ্গে কাজ চালানোর মত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তবে তৎকালীন জিয়া সরকারের সঙ্গে চীনের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর শান্তি বাহিনী সম্পর্কে চীন আর আগ্রহ দেখায় নি।

দীঘিনালাতে সদর দপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ছ'টি সেকটর, প্রত্যেকটি সেকটর চারটি জোন-এ ভাগ করে শান্তি বাহিনী সশস্ত্র এ্যাকশন কর্মসূচী শুরু করে ছিয়াত্তরে। কিন্তু তার আগে প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে পুলিশের সঙ্গে কয়েক-বার শান্তি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। শান্তি বাহিনীর মূল দায়িত্বে তখন ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু (তুঙ)। যদিও সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (প্রবাহন)। তবুও তিনি মূলতঃ প্রকাশ্য সংগঠন জনসংহতি সমিতির কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর সমস্ত ঘটনা নতুন মোড় নেয়।

খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট হলেও সংসদ বাতিল করেন নি। দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত জানতে তিনি বিশেষ আলোচনা চক্রের আহ্বান করেন। হঠাৎ উদ্ভূত নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেক সংসদ সদস্য তখন কিছুটা গা ঢাকা দিয়ে চলছিলেন। তাই সংসদ সদস্যদের অভয় দিয়ে ঢাকায় নেওয়ার উদ্যোগ মুস্তাক আহমেদ নিয়েছিলেন। তারই অঙ্গ হিসেবে লারমাকে ঢাকায় নিতে জেলা প্রসাশককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লারমা সংসদ সদস্য হলেও দেশের অন্যান্য সংসদ সদস্যদের সঙ্গে তার চলাফেরার ফারাক ছিল। প্রকাশ্য রাজনীতির খোলামেলা ভাবের বদলে তাঁর মধ্যে ছিল খুবই সতর্কতা এবং অংশতঃ

১। সি, জনসন, হি হু লেস ডাউন হিস গান লেস ডাউন হিস ফ্রিডমস্, আই, ডাব্লিউ, জি, আই, এ, নিউজলেটার, জুন-অক্টোবর, ১৯৮২, নং ৩১-৩২।

গোপনীয়তা। যার দরুণ উপজাতি জনগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁকে পেত না। তিনি কোথায় আছেন বা কোথায় থাকবেন, তা প্রায়শ কেউ জানত না। একই সঙ্গে প্রকাশ্য রাজনীতি এবং গোপন সংগঠন শান্তি বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার দরুণ তাঁর মধ্যে পাশাপাশি দুটো সত্তা সব সময় ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাকশালে যোগ দেওয়ার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে লারমা প্রকাশ্য রাজনীতিতে থাকতে চান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর তিনি হয়ত মনে করেছিলেন যে, দেশে গৃহযুদ্ধ অত্যাসন্ন। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের তুলনায় তখন দেশের প্রথম শ্রেণীর যে কোন নেতাকে যোগ্যতায় খাটো বলে মনে হয়েছিল। বিরাট নেতার বিরাট শূন্যতা অপূরণীয়। আর ঐ শূন্যতা ও অস্থিরতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন মুজিব বিরোধী বিভিন্ন শক্তি। মুজিবপন্থীরাও ছেড়ে কথা বলবেন না। তাঁরাও চেষ্টা করবেন ক্ষমতায় ফিরে আসার। এবং লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি দীর্ঘ মেয়াদী গৃহযুদ্ধ। লারমা তাই হয়ত দেরি করতে চাইলেন না। অত্যাসন্ন গৃহযুদ্ধের চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায্য অধিকার বা স্বায়ত্তশাসন অর্জনে সশস্ত্রভাবে চাপ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। শান্তি বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মজুত তখন সন্তোষজনক ছিল না। তবে লারমার ভরসা ছিল যে, গৃহযুদ্ধে সারা দেশ জ্বলবে। সরকার থাকবে নাম মাত্র। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে শান্তি বাহিনীর তেমন বড় সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে না। যদিও বা শান্তি বাহিনী সশস্ত্র এ্যাকশনে যাওয়ার পর সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে সাফল্যের পর সংগঠনের অস্ত্র ভাণ্ডার বেশ মজবুত করতে পেরেছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মগোপনের পর শান্তি বাহিনী এ্যাকশন কর্মসূচী শুরু করে। লারমা সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। জনসংহতি সমিতিও গোপন সংগঠনে পরিণত হয়। পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও প্রকাশ্য কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। দলের প্রচার পত্র জনসংহতি সমিতির নামে ছাপা ও বিলি করা হলেও শান্তি বাহিনীর ভূমিকা মুখ্য হয়ে ওঠে। মূল নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি থাকলেও শান্তি বাহিনীর নামই বেশী করে প্রচারিত হতে শুরু করে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও শান্তি বাহিনী, দুটি নাম একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কয়েকটি সীমান্ত বাহিনীর চৌকি এবং পুলিস ফাঁড়িতে শান্তি বাহিনী পরপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও রেশন হস্তগত করতে সক্ষম হয়। সামরিক বাহিনীর উপর গেরিলা কায়দায় আঘাত হেনেও শান্তি বাহিনী প্রাথমিক সাফল্য

লাভ করে। কয়েকবার সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পর শান্তি বাহিনী উপলব্ধি করে যে, সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রয়োজনে শিক্ষিত কমাণ্ডারের দরকার। তাই সশস্ত্র লড়াইয়ে যোগ দিতে শান্তি বাহিনী যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করে। সেই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল দ্রুত অবনতিশীল ও চরমভাবে হতাশজনক। কোন যুবক গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারত না। শান্তি বাহিনীর সদস্য, এই অভিযোগ আরোপ করে মিলিটারি তাদের ধরে নিয়ে যেত ক্যাম্পে। জেলা শহর রাঙামাটিতেও অনেক উপজাতি যুবক ও ব্যক্তিকে দিনরাত হয়রান করেছে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ। যে সব উপজাতি পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ছিল তাঁরা এবং কষ্ট করে হলেও কিছু পরিবার তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে পাঠিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহীতে সামান্য স্বস্তির জন্য। বাইরে পড়তে যাওয়া ছাত্ররা ছুটির দিনগুলোতেও বাড়ি যেতে পারত না। গেলেই তাদের মিলিটারি নির্যাতনের শিকার হতে হত। তদুপরি উপজাতিদের ওপর সরকারি ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও নির্যাতন দেখে এবং জাতীয়-ভাবে এর কোন প্রতিকারের পথ না পেয়ে নিজেরাই একটা বিহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তি বাহিনীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রও যুবক শান্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। বলা যেতে পারে সরকারি ভুল নীতিই তাদের ঠেলে দিয়েছিল শান্তি বাহিনীতে যোগ দিতে। এতে শান্তি বাহিনীর গুণ ও পরিমাণগত শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে সরকার শরণার্থী পুনর্বাসনের সঙ্গে তাল রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৈন্য সমাবেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, সাইমন উইনচেস্টারের লেখা 'সানডে টাইমস'-এর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, মালয়ের অরণ্যাঞ্চলে কমিউনিস্ট সশস্ত্র তৎপরতা দমনে সফল ও বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বৃটিশ আর্মির স্পেশাল আর্মড সার্ভিসের কর্নেল গিবসনের নেতৃত্বে একটি ইউনিট বাংলাদেশের মীরপুরে সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ১৯৭৭ সাল থেকে। এই ইউনিটটি, প্রতিবেদকের ভাষায়—

'Offend assistance to the Country's military government on

several occassions (including) providing equipments for dealing with the insurgents in the hills east of chittagong [১]

ব্যাপারটি নিয়ে বৃটেনের আরও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রেও বিস্তর লেখালেখি হয়। একই সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্নটি লিখিত ভাবে উত্থাপন করেন লেবার পার্টির এম পি. আলফস ডাবস্। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বলা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে এস. ও. এস-এর একটি ইউনিটের উপস্থিতি স্বীকার করা ছাড়া এ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া হয় নি।[২]

অন্যদিকে সামরিক সরকার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সামরিক অভিযানে এক-শ্রেণীর শরণার্থীদের ব্যবহার করতে শুরু করে। এতে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে একশ্রেণীর শরণার্থীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঁধতে লাগল। জমি ও টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর গুলি-গোলার মাঝে জড়িয়ে ফেলাতে শরণার্থীদের একটা অংশ পালিয়ে ফিরে যায় নিজেদের পূর্বতন এলাকায়। যারা ফিরে যাবার অনুমতি চাইল, সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের ফিরতে দেয় নি। বরং তাদের একটা অংশ দিয়ে তারা ক্রমশঃ শান্তি বাহিনীর নামে উপজাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। শরণার্থীদের বক্তব্য, তারা শান্তিতে বাঁচতে চায়। তারা ঝামেলা চায় না। সংঘর্ষ বা রক্তপাত তো নয়ই। একই সঙ্গে তাদের অভিযোগ, মিলিটারি নির্দেশ ও প্ররোচনা সত্বেও তারা যদি উপজাতি গ্রামে হামলা চালাতে রাজী না হয়, তাহলে তাদের ওপরও চালানো হয় নানা ধরণের অত্যাচার। বন্ধ করে দেওয়া হয় সাপ্তাহিক রেশন, টাকা-পয়সা। তাই অনিচ্ছা সত্বেও তাদের একটা অংশ উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

ফলে শান্তি বাহিনী আর সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ সীমিত না থেকে এক শ্রেণীর শরণার্থীরাও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

শান্তি বাহিনীর প্রতি উপজাতি জনগণের সহানুভূতিশীল অংশের সহানুভূতি

১। সাইমন উইনচেস্টার, সানডে টাইমস, ২৭শে মার্চ, ১৯৮৩, লণ্ডন, বাংলাদেশ পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট, লণ্ডন ১৯৮১।

২। অ্যান্টি স্লেভারি সোসাইটি, দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস, লণ্ডন, সিরিজ-২, ১৯৮৪।

প্রথম দিকে নিঃসংকোচ ছিল না। বিশেষ করে শক্তি ও জনসমর্থন কিছুটা যোগাড় করার পর শান্তি বাহিনীর সমর্থক নন কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় উপজাতি সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসী, এমন অরাজনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের শান্তি বাহিনী জাতিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। গ্রামাঞ্চলে কয়েকজনকে সাজাও দেওয়া হয়। চূড়ান্ত সাজা হিসেবে কয়েকজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের বদলে শান্তি বাহিনীর কোন কোন নেতা ও কর্মী বিচারকের আসনে বসে যেত বলে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, মনঃপূত নয়, এমন রায় ঘোষণার জন্য বিচারক বা গ্রাম প্রধানকে বিচারের আসরে প্রকাশ্যে বেত মারার ঘটনাও বেশ কয়েকটি ঘটেছিল। উপজাতি বুদ্ধিজীবীরা শান্তি বাহিনীর কার্যকলাপের গঠন মূলক সমালোচনা করেছিল। শান্তি বাহিনী ধরে নেয় যে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের হেয় প্রতিপন্ন করতে শান্তি বাহিনী কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এতে বুদ্ধিজীবীদের সহানুভূতি শান্তি বাহিনী অনেকাংশে হারায়। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে থাকেন। তাঁদের চিন্তা ভাবনার প্রভাব শহরাঞ্চলের ছাত্রযুবকদের উপর থাকাটা স্বাভাবিক। এই কারণে এবং প্রথমত ও প্রধানত গ্রামের যুবকদের নিয়ে শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল বলে শহর ও গ্রামের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে একটা ভেদ রেখা টানা হয়। শিক্ষিত ও ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন একটা শক্তিকে শান্তি বাহিনী বিশেষ নীতি অনুসরণ করে সযত্নে দূরে রাখে। পরবর্তীতে সংগঠনের প্রয়োজনে শহরের ছাত্র যুবকদের শান্তি বাহিনীতে রিক্রুট করা হয়েছিল সত্য। তবে যে সন্দেহ ও দূরত্ববোধ প্রথমদিকে জন্ম নিয়েছিল, তা কখনও দূর হয় নি।

শান্তি বাহিনীর মূল দুর্বলতা হল লক্ষ্য, ও লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাব। এই কারণেই শান্তি বাহিনীর নেতারা সাধারণ কর্মীদের রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে পারেন নি। শান্তি বাহিনীর মূল দাবি, ডিষ্ট্রিক্ট অটোনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের রূপরেখা কি ধরণের হবে, তা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের মধ্যে নানা মত। কারও মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব একটি নির্বাচিত আইন পরিষদ হল স্বায়ত্বশাসনের প্রধান ও প্রথম শর্ত। এই আইন পরিষদের সুপারিশ কিংবা অনুমোদন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে, এমন শাসনতান্ত্রিক গ্যারান্টি থাকতে হবে। কেউ মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর রাজ্যগুলো যে ধরণের স্বায়ত্বশাসন

ভোগ করে, সেই পরিমাণের সুযোগ সুবিধাই হল আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের সঠিক রূপ। কেউ আবার মত পোষণ করেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোন পথ খোলা নেই। অতি চালাক কোন কোন নেতা এবং কর্মী প্রচ্ছন্ন বক্তব্যের আড়ালে তাঁদের যুক্তি রাখেন। তাঁদের মতে, উপজাতি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় হল লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে যদি আদায় সম্ভব হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি সেই অধিকার আদায়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাই চাই। লক্ষ্য সম্পর্কে নেতাদের স্পষ্ট এক বক্তব্য না থাকার দরুন কর্মীরা বিভ্রান্ত। বেশী বিভ্রান্ত সাধারণ উপজাতি জনগণ।

শান্তি বাহিনী টি. পি. পি-র সম্ভাব্য অভ্যুত্থান কাটিয়ে উঠতে পারলেও পরবর্তীতে দ্বন্দ্ব, আরও পরে গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত হয়ে পড়ে। আশি সালে তা প্রকট আকার ধারণ করলেও এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল পঁচাত্তরে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বাকশালে যোগদানের প্রশ্নে শান্তি বাহিনী প্রায় দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছিল। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের পর লারমা প্রকাশ্য রাজনীতি ছেড়ে সশস্ত্র এ্যাকশনে যাওয়ার পর এই অবস্থার সামাল দেন। কিন্তু দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারেন নি। পঁচাত্তরের ছাব্বিশে অক্টোবর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু (তুঙ) পানছড়ির কাছাকাছি অসহায়ের মত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সন্তুর সমর্থকদের সন্দেহ, এর পিছনে বিরোধী গোষ্ঠীর হাত রয়েছে। সন্দেহ সংঘর্ষে রূপ নিতে দেরি হয়নি। শান্তি বাহিনীর গোপন ঘাঁটির কাছাকাছি গ্রামগুলো সেই সময় পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিছু কর্মী সংঘর্ষের পরিণতিতে হতাশ হয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। লারমার শক্ত হাতের নিয়ন্ত্রণ শান্তি বাহিনীকে আরও মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিল সত্য, কিন্তু জনমনে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে পূর্বের ধারণায় চিড় ধরা রোধ করতে পারেনি। ছিয়াত্তর থেকে সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী আসার স্রোত বেড়ে যায়, মিলিটারি সরকারও শান্তি বাহিনী দমনে ব্যাপক মিলিটারি অপারেশন শুরু করে। সরকারি এই পদক্ষেপ শান্তি বাহিনীর জন্য পরোক্ষ আশীর্বাদের রূপ নেয়। একদিকে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াতে শান্তি বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে মিলিটারি অত্যাচার এবং মিলিটারি প্ররোচনায় এক শ্রেণীর

শরণার্থীদের দ্বারা বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়া উপজাতি জনগণ, ষোলকলায় পূর্ণ না হলেও তাদের হয়ে লড়েছে—এই সান্ত্বনায়, শান্তি বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

আশির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়। শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তখন প্রায় দু'লাখ। শান্তি বাহিনীর মূল কেন্দ্রগুলি ঘিরে সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়। এতে গৃহহারা হয় হাজার হাজার উপজাতি। এমন পুনর্বাসনের অন্যতম কারণ শান্তি বাহিনী আর শান্তি বাহিনীর গোপন ঘাঁটির কাছাকাছি স্থানীয় উপজাতিদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তার সঙ্গে বৃদ্ধি করা হয় সাধারণ উপজাতিদের উপর মিলিটারি নিপীড়ন। শান্তি বাহিনীর প্রচারপত্রে জানা যায় শরণার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ইচ্ছা প্রথমদিকে শান্তি বাহিনীর ছিল না। শান্তি বাহিনী শুধু বহিরাগত শরণার্থীদের যার যার এলাকায় ফিরে যাবার নির্দেশ জারি করত। শান্তি বাহিনীর বক্তব্য ছিল, তাদের মূল শত্রু মিলিটারি সরকার। তারা লড়ছে সরকারের উপজাতি উচ্ছেদ ও নিধন নীতির বিরুদ্ধে। শরণার্থীদের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু তারা যদি সরকারি যন্ত্রের হাতিয়ার হয়ে উপজাতিদের জমিজমা দখল ও অত্যাচার চালায়, তাহলে শান্তি বাহিনী তার সমুচিত ব্যবস্থা নেবে। শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে আসা কমেনি। বরং তৎকালীন সরকার তা বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ হারে। গভীর পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলের উপজাতি গ্রামগুলি ছাড়া বাকি সব গ্রামের চারপাশে, নদীর পারে, পাকা সড়কের ধারে, পায়ে চলা পাহাড়ী রাস্তার পাশে দ্রুত গড়ে ওঠে সরকারি উদ্যোগে শরণার্থী গ্রাম। এতে শান্তি বাহিনীর চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। শান্তি বাহিনী ও তার প্রতি সহানুভূতিশীলদের পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে ওঠে। তদুপরি চার পাঁচ বছরের রক্তাক্ত লড়াইয়ে শান্তি বাহিনী সাফল্য দাবী করলেও সরকারি বাহিনীর কয়েকটি ফাঁড়ি দখল ও কিছু সদস্যকে হতাহত করা ছাড়া, তাও নিজেদের ক্ষতি অস্বীকার করে নয়, দাবী আদায়ের প্রশ্নে কোন প্রকার অগ্রগতি হয়নি। অথচ সাধারণ উপজাতিদের দিতে হয় চরম মূল্য। এই সমস্ত কারণে শান্তি বাহিনী আর উপজাতি জনগণের মধ্যে ক্রমশ চিন্তার ব্যবধান বাড়তে শুরু করে। বলা যায় সাধারণ উপজাতিরা শান্তি বাহিনী সম্পর্কে মোহ হারাতে থাকে। অন্যদিকে

শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র এ্যাকশনের যে তীব্রতা ছিয়াত্তরে ছিল, তা হ্রাস পায়। বৃদ্ধি পায় লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক। স্বাভাবিকভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবলতম হয়।

উনাশির তেইশে জানুয়ারী তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপজাতি জনগণের প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে শান্তি বাহিনীর নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু (তুঙ) ও চাবাই মগকে জেল থেকে মুক্তি দেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চাবাই মগ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু (তুঙ)ও গোপন ঘাঁটিতে তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপজাতি সমস্যা সমাধানের সূত্র নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হবার পর সন্তু লারমা শান্তি বাহিনীর গোপন ঘাঁটিতে ফিরে যান। শোনা যায় সন্তু লারমা ও চাবাই মগের মুক্তি নিয়ে শান্তি বাহিনীর কিছু নেতা ও কর্মীদের মনে তখন নানা প্রশ্ন উঁকি মারছিল।

সাংগঠনিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির জাতীয় কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসে বিরাশির অক্টোবরে। এই অধিবেশনে পুরান বিরোধ আর নতুন দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। পার্টির ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে চেয়ারম্যান ও ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-কে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। লারমার বিরোধীতা সত্ত্বেও কংগ্রেসে উপস্থিত অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর সমর্থনে জ্যোতিরিন্দ্র লারমা সন্তু পুনরায় ফিলড কমাণ্ডার নির্বাচিত হন।

পার্টির কংগ্রেসে জোর সশস্ত্র এ্যাকশন চালানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু দেশের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে জোর সশস্ত্র এ্যাকশন চালানো বা চালিয়ে ন্যূনতম সফলতা পাওয়ার মত অবস্থা তখন ছিল না। শান্তি বাহিনীর ফিলড কমাণ্ডার সন্তু লারমা সময় নিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু ও সুসংহত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে চাইলেন। কিন্তু দলের একটি গোষ্ঠী সন্তু লারমার এই নীতির ভেতর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান। সেই সময় শান্তি বাহিনীর মধ্যে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে বিভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিমূলক আচরণ। এই নিয়ে শুরু হয় আবার দ্বন্দ্ব। সংঘাতও বেঁধে যায় কয়েক জায়গায়। উভয় পক্ষ থেকে অন্তর্দলীয় আপোসের চেষ্টা করা হয়। আপোস রফার আলোচনা চলাকালীন তিরাশির জুনের পর পর কয়েকটি ঘটনার পর ঐক্য

প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। লেগে যায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেকটর ও জোন দখলে রাখার রক্তাক্ত লড়াই।

মূল লড়াইয়ের ভিত্তি হিসেবে যে দুটি মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছিল—পরিণতিতে দুটি গোষ্ঠী, তার একটি হল শান্তি বাহিনীর লড়াই একদিনের নয়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ও চরমতম সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি ও বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মুক্তি সংগ্রামের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হওয়া।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী জাতীয়তাবাদ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে। কিন্তু সেই তুলনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন ঘোষিত অন্যতম রাষ্ট্রনীতি, সমাজতন্ত্র তখনও বাংলাদেশের মাটিতে ও গণমানুষের মনে দৃঢ় ভিত গাড়তে পারেনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী স্তর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে এই উত্তরণ ঘটা সহজসাধ্য ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামকে কয়েক যুগ ধরে লড়তে হয়েছিল হাত বদল করা উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা তাই জাতীয়তাবাদী হলেও শেষটা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক। যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি। বাংলাদেশে তা হয়নি। শান্তি বাহিনীর ক্ষেত্র ছিল আরও সীমিত। রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ, অনেকাংশে অশিক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র জাতি-সত্তাবোধ, (Ethnic feelings) বৃহৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ দেওয়া তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। উপজাতীয়তাবোধ জাতীয়তাবাদী চেতনার স্তরে উন্নীত হওয়ার আগেই যদি আবার স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়, তাহলে লড়াইয়ের মূল ভিত থেকে যায় দুর্বল। যেখানে লড়াইয়ের বিভিন্ন স্তর না পেরোনোর বিরাট ফাঁক থাকে। লড়াইয়ের পরিণতিও হয় ভয়াবহ ও মারাত্মক। শান্তি বাহিনীর প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে রণনীতি ও রণকৌশলে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শান্তি বাহিনীর অপর গোষ্ঠীর মতে, দীর্ঘ মেয়াদী লড়াইয়ে লিপ্ত হবার মত সুযোগ এবং সময় নেই তাদের। সরকার যে ব্যাপকহারে শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে আনছে, এবং উপজাতিদের উচ্ছেদ করছে, তাতে অনতিবিলম্বে উপজাতিরা প্রথমে নিজভূমে পরবাসী, তারপর ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন কোন কিছুই আর তাদের পথ দেখাতে পারবে না। সুতরাং প্রয়োজন জোরালো সশস্ত্র এ্যাকশন। হয় এখনই, নয়ত কখনও নয়। দীর্ঘ লড়াইয়ে বিশ্বাসী

প্রথম গোষ্ঠী 'লাম্বা' নামে অভিহিত হয়। (চাকমা শব্দ লাম্বা মানে দীর্ঘ)। দ্বিতীয় গোষ্ঠী 'বাধি' নামে পরিচিত। (চাকমা শব্দ বাধি মানে সংক্ষিপ্ত বা খাটো)।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী তাৎক্ষণিক এ্যাকশন বলতে কি বোঝাতে চায়, জোরালো সশস্ত্র এ্যাকশন কার বিরুদ্ধে এবং কেন, শেষ লক্ষ কি, লড়াইয়ের এইসব মূল বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার নয়। বরং তাদের বক্তব্যে হতাশার সুর সুস্পষ্ট। তাই ধরে নেওয়া যায়, শান্তি বাহিনীর দ্বন্দ্ব আদর্শগত নয় ততটা, যতটা দলীয় ক্ষমতা দখলের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সার্বিক পরিস্থিতি দেখে শান্তি বাহিনীর নেতা ও কর্মীদের হতাশা। শান্তি বাহিনীর কয়েকজন চাকমা নেতার অ ত্যাভিমানও সংগঠন ভাঙার জন্য দায়ী বলে উপজাতি বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা।

জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী যে নেতা ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পারতেন সংগঠনের ঐক্য ধরে রাখতে। শান্তি বাহিনীর নাম মাত্র সাফল্য, লক্ষ্য অর্জনে লড়াইয়ের ভবিষ্যত, সাংগঠনিক অবস্থা দেখে হয়ত তিনিও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অনুমান করা হয়, সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব চরমে ওঠার পর লারমা কিছুটা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ধারণার মূল কারণ হিসেবে বলা হয়, শান্তি বাহিনীর ভেতর গোষ্ঠী কোন্দল মিটিয়ে ফেলতে শক্ত হাতের নিয়ন্ত্রণের বদলে লারমা উদারতা দেখিয়েছিলেন। একটা গোষ্ঠীর প্রতি নীরব সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি চেষ্টা করেছিলেন সকলকে নিয়ে চলতে। কোন্দল নয়, ঐক্যই একমাত্র পৌঁছে দিতে পারে অভীষ্ট লক্ষ্যে, এই চেতনা জাগাতে। কিন্তু তাঁর এই উদারতাকে দুর্বলতা মনে করে পরস্পর বিরোধী দুটি গোষ্ঠীই গোষ্ঠী কোন্দল চরমে নিয়ে যেতে থাকে। পরিণামে লারমা সংগঠনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেন। গোষ্ঠী কোন্দলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের নির্মম পরিণতিতে তিরাশির দশই নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর গোপন আস্তানায় নৃশংসভাবে নিহত হন। এই ঘটনার পর শান্তি বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে দু'ভাগ হয়। লাম্বা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু (তুও)। বাধি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে এলেন ভবতোষ দেওয়ান (গিরি) ও প্রীতিকুমার চাকমা (প্রকাশ)।

শান্তি বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকে মনে করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের আত্মমর্যাদা আদায়ের লড়াইয়ের আপাতঃ অপমৃত্যু ঘটেছে। তাঁদের বক্তব্য, লারমার নেতৃত্বের

কিছু ত্রুটি হয়ত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর ভাবমূর্তিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল উপজাতিদের বাঁচার লড়াই। তাঁকে কিছু সময় দিলে তিনি পার্টির ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারতেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে পর্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদি নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু উপজাতিদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে সরকার এবং দেশেরও। কারণ শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতার উদ্দেশ্য হল, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় রাজি হতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপে বসার জন্য চাই জনগণের সমর্থনপুষ্ট একজন প্রতিনিধি। একমাত্র লারমারই ছিল সেই বৈধ অধিকার এবং যোগ্যতা। তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতা। তাঁরা মনে করেন, উপজাতি নেতাদের মধ্যে বর্তমানে এমন কেউ নেই, যার পেছনে রয়েছে জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন। 'তাই তাঁরা আশংকা করেন, সরকার যদি উপজাতি নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপে বসতে রাজি হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছুতে নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

শান্তি বাহিনী আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাগ হবার পর আত্মঘাতি সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করেছে।

শান্তি বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য ও আর্থিক যোগানের মূল উৎস ছিল উপজাতি গ্রামগুলো। দরিদ্র গ্রামবাসীরা কষ্ট হলেও, যা পারত শান্তি বাহিনীকে দিত। কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ বন্দুকের মুখে। শান্তি বাহিনীর গোপন ঘাঁটি আর অধিকাংশ উপজাতি গ্রামের মাঝখানে সরকার শরণার্থীর দেওয়াল বসানোর ফলে শান্তি বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে শান্তি বাহিনীর আয়ত্বাধীন গভীর অরণ্যাঞ্চলের গ্রামগুলোর উপর যোগানের বোঝা ভারী হয়ে নেমে আসে। কিন্তু তা বহন করার মত ক্ষমতা গ্রামবাসীদের নেই। শান্তি বাহিনী দু'ভাগ হবার পর এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। আগে ছিল একটি দল। বর্তমানে দুটি। দুটি দলকে দিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের খাওয়ার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গ্রামবাসীরা তাদের অক্ষমতা আগে না জানালেও এখন জানাচ্ছে। ইদানীং শান্তি বাহিনী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে গ্রামবাসীদের উপর জোর জবরদস্তি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে উপজাতির ক্ষোভ ক্রমশ জমে উঠছে। গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতনের জন্য শান্তি বাহিনী একদল আরেক দলকে দোষারোপ করছে। কোন দল দায়ী সে

সম্পর্কে জনগণের ধারণা পরিষ্কার নয়। যে গোষ্ঠীই করুক না কেন, এতে সংগঠনের ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা জ্যামিতিক হারে হ্রাস পাচ্ছে। একপাশে শান্তি বাহিনী, অপর পাশে সরকারি বাহিনী, মাঝখানে রয়েছে সাধারণ উপজাতিরা। নির্যাতন ও নিষ্পেষণে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে।

একসময় শান্তি বাহিনীর আর্থিক যোগানের উৎস পরোক্ষ ভাবে ছিল সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি অপারেশনের জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বত্র ব্যাপক মিলিটারি মবিলাইজেসন। কিন্তু দু' তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছাড়া সকল ঋতুতে চলাচলের উপযোগী কোন রাস্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল না। সরকার তাই প্রথম জোর দেয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের উপর। প্রথম দিকে শান্তি বাহিনী সড়ক নির্মাণে বাধা দেয়।। রাস্তার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সরকার ঠিকাদারদের দিয়ে শান্তি বাহিনীর কাছে মোটা চাঁদার প্রস্তাব রাখে। শর্ত, রাস্তার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

শান্তি বাহিনীর নেতারা প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হলেও দারুণ আর্থিক সংকট বিবেচনা করে তারা রাজী হয়ে যান। সরকার ঠিকাদারদের মোট বিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ শান্তি বাহিনীর চাঁদা হিসেবে বেঁধে দেয়। তেমনি চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলের জন্য প্রয়োজন কাঁচা মাল বাঁশের। বাঁশের ঠিকাদারদেরও শান্তি বাহিনীর চাঁদার জন্য বিলের একটা নির্দিষ্ট অংশ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া এবং সরকারি ট্রুপ সব জায়গায় না পৌছান পর্যন্ত শান্তি বাহিনী সরকার থেকে এই পরোক্ষ চাঁদা পেয়েছে।[১]

প্রথমে সরকারি পরোক্ষ চাঁদা বন্ধ, তারপর দলে ভাঙন, পরিণতিতে উপজাতি জনগণের মোহ কেটে যাওয়া, সব মিলিয়ে শান্তি বাহিনী দারুণ সংকটে পড়ে। সংকটের ফলে দিশেহারা হয়ে শান্তি বাহিনীর অনেক নেতা এবং কর্মী বাংলাদেশ মিলিটারি সরকারের আহ্বানে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণকারীদের সংখ্যা স্ফীতি ঘটছে বলে সরকারি মহল থেকে জানানো হয়েছে।

শান্তি বাহিনীর দুই গোষ্ঠীর কার মত ও পথ সঠিক, নাকি উভয় গোষ্ঠীরই মত

১। সূত্র, জনসংহতি সমিতি।

ও পথ বেঠিক, তা বলার মত চূড়ান্ত সময় এখনও আসেনি। সেই রায় ঘোষণা করার অধিকার আছে শুধু আগামী দিনের ইতিহাসের।

শান্তি বাহিনী এখনও ভাঙনের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অন্তর্ঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সরকারি বাহিনী তেমন একটা সংঘর্ষের মুখোমুখী ইদানীং আর হচ্ছে না। তার অর্থ অবশ্য এই হওয়া উচিত নয় যে শান্তি বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিংবা সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সশস্ত্রভাবে তৎপর নিয়ন্ত্রিত একটি গোপন দলের চাইতে অনিয়ন্ত্রিত দলের মোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য। শান্তি বাহিনীর প্রাথমিক ভাঙন পরবর্তীতে আরও ভাঙনের কারণ হতে পারে। ভাঙন হলে সংগঠনের শক্তি হ্রাস পায়। কিন্তু তার সঙ্গে খুলে যায় এখানে ওখানে অনেকগুলো অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত ফ্রন্ট। যে কোন নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে পার্বত্য গভীর অরণ্যাঞ্চলে এই গেরিলা তৎপরতা সমূলে বিনষ্ট করা সহজসাধ্য নয়। স্মরণে রাখা উচিত, শান্তি বাহিনী সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা খুবই কম, সম্ভবত হাজারের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু সংখ্যা স্বল্পতার শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছিল সদস্যদের ত্যাগ, সাহসিকতা আর মৃত্যুকে জয় করার ইস্পাত কঠিন সংকল্প। তাই দেখা যায়, স্বল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত শান্তি বাহিনীর গেরিলা তৎপরতা দমন করতে সরকারকে নিয়োগ করতে হয়েছে এক ডিভিশনের বেশি সামরিক ও আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের মূল কারণ জিইয়ে রেখে মিলিটারি অপারেশন চালিয়ে সমস্যার জটিলতার গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া শান্তি বাহিনীকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। ভাঙনের পর জনমনে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে যে ভীতি ও বীতশ্রদ্ধা জন্ম নিয়েছে, তা থেকে নিজেদের গা মুছে ফেলার জন্য উভয় দল হয়ত এক সময়ে শান্তি বাহিনী নাম পরিত্যাগ করবে। শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু যতদিন উপজাতিদের মৌলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হয়, ততদিন অন্য নামে এক বা একাধিক গোপন সংগঠনের পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে আদিত্য

কুমার দেওয়ানের মূল্যায়ণ যথার্থ, 'With the emergence of Bangladesh, this district (chittagong Hill Tracts) has become one of the serious trouble spots of South Asia. The problem is similar to the Naga and Mizo in Eastern India, the Kurds in Iran and Iraq, the Eritreon movements in Ethiopia and similar movements throughout the world'.[১]

১। এ. কে. দেওয়ান, ক্লাস এন্ড এথিনিসিটি ইন হিলস অফ বাংলাদেশ, (পি. এইচ. ডির জন্য লিখিত অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ) নৃতত্ত্ব-বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৭৯, পৃঃ—৭।

শেষ কোথায় ?

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের সমস্যাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণেই সমস্যার সৃষ্টি, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সরকার ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে উপ-জাতিদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। বোর্ডের মোট সদস্যের ষাট শতাংশ উপজাতি হলেও মূল নিয়ন্ত্রণ সরকারের ক্যাবিনেট ডিভিশনের হাতে। উন্নয়ন বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নয়। অথচ এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ক্ষমতা সাধারণতঃ হয়ে থাকে স্বায়ত্তশাসিত। বোর্ডের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যও তা প্রয়োজন। নেতৃস্থানীয় উপজাতিদেরকেই বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। অথচ অর্থনৈতিকভাবে কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উপজাতিদের কল্যাণ হবে, সেই নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা গৌণ। ক্ষমতাও নিতান্তই সীমিত। নেই বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও তাদের উন্নয়নের ওপর মোহাম্মদ এম. হক তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ, 'Government Institutions and underdevelopment : a study of the tribal peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh'-এর একস্থানে বোর্ড সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, 'Real authority lies with the Cabinet Division at the Central Secretariat···Even if the tribal component of the Board's personnel were 100 percent instead of the present 60 percent and the tribal representatives were in the majority in the consultative Committee the situation could not have changed substantially.'[1] তাই অভিযোগ উঠেছে,

M. M. Hoque, Government Institution and underdevelopment, a study of tribal peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Institute of local Government Studies, University of Birmingham, Dec'. 82.

বোর্ডের সিংহভাগ টাকা মিলিটারি খাতে ও শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্যই খরচ করা হয়, উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়। উপজাতিদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। ব্যাপক শরণার্থী পুনর্বাসনের ফলে জমি হারাতে বাধ্য হওয়া উপ-জাতিরা অর্থনৈতিকভাবে আরও পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

এটা সত্য যে, চল্লিশ দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম আর আশির দশকের পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে ফারাক অনেক। জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। স্কুল-কলেজ গড়ে উঠছে মহকুমায়, থানায়। অফিস-আদালত খোলা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। কল-কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প। বাড়ছে ব্যস্ততা। প্রসারিত হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র। কিন্তু সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করার বাস্তবোচিত পদক্ষেপ না থাকার দরুণ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে সমষ্টিগতভাবে উপজাতিদের জড়ানো যায় নি। তাই দেখা যায়, যাঁদের আগেও ছিল, এমন মুষ্টিমেয় উপজাতিদের আয় ও জীবনধারণের মান আরও উঁচুতে উঠে যাওয়া ছাড়া জেলায় গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কল্যাণে যা কিছু অর্জিত অর্থনৈতিক সুফল সাধারণ উপজাতিদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী কাগজের কলে মোট ৬,০০০ কর্মরত শ্রমিকের মাত্র ৪০ জন হলেন উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত রেয়ন, ম্যাচ ও সিগারেট কারখানাগুলিতেও উপজাতি শ্রমিকের সংখ্যা একই ধরণের। ১৯৭৮ সালের ১৯শে এপ্রিলের The Economic and Political Weekly-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'The industries and factories in the Chittagong Hill Tracts do not benefit the tribal people as all employment goes to the non-tribals. More factories and industries mean more jobs for the non-tribals (plains men), and more hardship to the hill people'.

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তৈরি হয়েছে বিরাট একটি কৃত্রিম হ্রদ। হ্রদে সরকারি উদ্যোগে মাছচাষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা যাতে মাছ ধরে ও বিক্রী করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে সেইজন্য সরকার জাল ও মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম; যেমন নৌকা, স্পীডবোট কেনার জন্য বিশেষ ঋণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু বাজার তৈরি করা হয়নি যথাযথভাবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে,

মাছ-শিকারীরা এক সের মাছ বিক্রি করছেন ·৭৫ পয়সায়, তা পাইকারী বিক্রেতারা বিক্রি করছেন ২ টাকা সের এবং শহরাঞ্চলে তা বিক্রি হচ্ছে সের প্রতি ১৫ টাকা। কাঁচামালের বাজারের অবস্থাও তথৈবচ উপজাতি কৃষকরা অত্যন্ত নিচু দরে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বিক্রী করতে বাধ্য হন। সরকারি উদ্যোগে এই ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা না থাকার দরুন উপজাতি কৃষকরা দারুণভাবে মার খাচ্ছেন।

কখনও আবার উপজাতি সমস্যাকে অভিহিত করা হয়েছে সামাজিক সমস্যা হিসাবে। উপজাতিদের প্রচলিত প্রথা ও কাঠামো মতে তিন রাজা সমাজের তিন প্রধান পুরুষ। তিন রাজার অধিষ্ঠান দিবস বা পুণ্যাহ্ অথবা রাজন্য ভাতা যাতে ঠিক ভাবে হয়, তার দিকে নজর দেওয়া। রাজার প্রতি উপজাতিদের দুর্বলতা থাকলেও তা ক্রমশঃ ক্ষয়ে আসছে। তিন রাজাকে যৎসামান্য লোক দেখানো রাজন্য ভাতা কিংবা অধিষ্ঠান দিবস পালনের জন্য সরকারি অনুষ্ঠান কয়েক বছর আগের দৃষ্টিতে আর সাধারণ উপজাতিরা দেখছে না। সামাজিক সমস্যা বলতে তারা এখন ব্যাপক অর্থে বোঝে। সামাজিক কাঠামো আগের মত নেই। ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। উপজাতি সমস্যা বর্তমানে চরম সংকটের মুখোমুখি। সেই ক্ষেত্রে তিন রাজার সুযোগ সুবিধা যদি কিছুটা বাড়ে, তাহলে উপজাতিদের মনে তা কোন আবেদন সৃষ্টি না করারই কথা।

উপজাতি সমস্যাকে কোন সময় বলা হয়েছে সাংস্কৃতিক সমস্যা। সাংস্কৃতিক সমস্যা মেটানোর জন্য গঠন করা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড। এই বোর্ড প্রায় হারিয়ে যাওয়া উপজাতি গল্প, গান, উপাখ্যান উদ্ধার করে বই আকারে প্রকাশের চেষ্টা করছে। বাংলা হরফে মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা ভাষায় সাময়িকী, কখনও বা বই প্রকাশিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সরকারি অনুদানে এই সব কিছু সম্ভব হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠা স্বাভাবিক—তিন প্রধান উপজাতি সম্প্রদায়ের—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা—নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। কেন সেই হরফে সাময়িকী বের করছে না সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড? কেন সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব পরিচালনাধীনে উপজাতি হরফের ছাপাখানা খুলছে না? ক্ষুদ্র কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়েরও নিজস্ব অক্ষর আছে। সেইগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা কেন করা হচ্ছে না? শুধু তাই নয়, উপজাতিদের মনে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের আত্মবিকাশ ও আত্মিক উন্নয়নে সরকার কতটুকু যত্নশীল, সেই বিশ্বাসটুকু জাগানোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে একটা

পর্যায় পর্যন্ত উপজাতি ছাত্রদের জন্য কেন বাধ্যতামূলক উপজাতি ভাষা ও সাহিত্য কোর্স এখনও চালু করা হয় নি ?

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অসন্তোষকে কখনও আবার বলা হয়েছে আইন শৃংখলার অভাবজনিত অবস্থা। আইন শৃংখলার অবনতি রুখতে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে হাজার হাজার মিলিটারি, পুলিশ, বি. ডি. আর.। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে গত প্রায় একদশকে সরকারি ও শান্তি বাহিনীর সদস্য, সাধারণ উপজাতি ও শরণার্থী সব মিলিয়ে কয়েক হাজার লোক নিহত, হাজারের অধিক উপজাতি জেলবন্দী ও কয়েক হাজার পরিবার গৃহহারা হয়েছে।[১] আইন শৃংখলা অবনতির অজুহাতে সরকার এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপদ্রুত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে মিলিটারি অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। এত কিছুর পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কোন সুরাহা না হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শুধু আইন শৃংখলার সমস্যা নয়। অসন্তোষের কারণ আরও গভীরে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সন্তুষ্ট রাখার নামে শুধু তিন রাজাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। বৃটিশ থেকে আজকের বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার এই ট্রাডিশন সমানভাবে অনুসরণ করে গেছে এবং করছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজা ত্রিদিব রায়কে সম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। রাজা ত্রিদিব রায়ের মা রাজমাতা বিনীতা রায় ও কাকা কুমার কোকনাদক্ষ রায়কে এই উদ্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে পাঠানো হয়েছিল। রাজা ত্রিদিব রায় তখন জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘে থাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজা ত্রিবিদ রায় বাংলাদেশ সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তখন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আদম মালিক। রাজা ত্রিদিব রায় ও আদম মালিক ছিলেন ব্যক্তিগত বন্ধু। আদম মালিক রাজা ত্রিদিব রায়কে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। স্থায়ী বন্ধু বা স্থায়ী শত্রুও কেউ নেই। তিনি নিজেও পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু

১। সাইমন উইনচেস্টার, বুডোভিস্ট ট্রাইব স্লটারড ইন জংগল জেনোসাইড, দি সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৪ অক্টোবর, ১৯৮৪।

পাকিস্তানের বন্ধুরা পাকিস্তানের পতন রোধ করতে পারেন নি। বাংলাদেশটি একটি বাস্তব সত্য। রাজনৈতিক কারণে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়েছে। আদম মালিক নিজেও বাংলাদেশ ঘুরে এসেছিলেন। তাই আদম মালিক রাজা ত্রিদিব রায়কে বার বার অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজা ত্রিদিব রায় তাঁর বন্ধুর অনুরোধ রাখেন নি।[১]

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন মং রাজা মং প্রু চাই চৌধুরী। পরবর্তীতে বাকশাল গঠন করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই জেলাতে দুই রাজাকে গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল। যদিও গভর্ণর হওয়ার মত যোগ্যতা সাধারণ উপজাতিদের মধ্যে অনেকের ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে রাজমাতা বিনীতা রায়কে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে জিয়া অবশ্য ট্রাডিশন ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। রাজপরিবারের কিছুটা বাইরের সুবিমল দেওয়ানকে একবার উপদেষ্টা এবং অংশৈ প্রু চৌধুরীকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া মুখে স্বীকার না করলেও তাঁর কার্যকলাপে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা তিনি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে চান। তাই তিনি আশির গোড়ার দিকে গঠন করিয়েছিলেন ট্রাইবাল কনভেনশন। তিন সার্কেলের তিন রাজা এবং চারু বিকাশ চাকমা, শান্তিময় দেওয়ানের মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও এই ট্রাইবাল কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন মন্ত্রী অংশৈ প্রু চৌধুরীও ছিলেন কনভেনশনের অন্যতম সদস্য। শান্তি বাহিনীর বিকল্প হিসেবে সরকার ট্রাইবাল কনভেনশনকে পেতে চেয়েছিল। কনভেনশনের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল মঞ্জুরের নির্দেশ মতই কনভেনশন চলত। সামরিক সরকারের সুবিধামাফিক চলতে গিয়ে কনভেনশন সামগ্রিকভাবে উপজাতি জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও, কনভেনশন গঠিত হবার তিন মাস পর কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ও উপজাতি স্বার্থ রক্ষার জন্য সূত্র হিসেবে চারটি দাবি পেশ করেন।

এক, একজন চীফ কমিশনারকে প্রশাসনিক প্রধান করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

১। রাজমাতা বিনীতা রায়, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রাঙামাটি, ১৯৭৩

প্রবর্তন। পদাধিকার বলে চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি. ও. সি.-ই হবেন চীফ কমিশনার। দুই, চীফ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি উপজাতি মন্ত্রণালয় গঠন। তিন, উপজাতি সম্পর্কিত রিপোর্ট সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিকট দাখিল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দায়িত্বভার পালন করার জন্য পৃথক একটি সচিবালয় স্থাপন। চার, নির্বাচিত ষাট জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক পরিষদের কাজে দায়বদ্ধ এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

দাবিগুলো নিয়ে কনভেনশনের নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রাথমিক আলোচনা শুরুও করেছিলেন। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাদের অনুরোধে প্রেসিডেন্ট জিয়া শান্তি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গেও আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর সব উদ্যোগ ভেস্তে যায়।

উপজাতি জনগণের একটা অংশ এবং কিছু নেতার জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া কোন পদক্ষেপেব প্রতি চরম অবিশ্বাস কোন ক্ষেত্রে চরম বৈরিতা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। জাতীয় দলে থেকে জাতীয় পর্যায়ে যে অনেক কিছু করা যায়, তার প্রমাণ জাসদের প্রাক্তন সংসদ সদস্য উপেন্দ্রলাল চাকমার প্রশংসনীয় ভূমিকা। জাতীয় সংসদে, সংসদের বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি অত্যাচারের কথা যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, মিলিটারি অত্যাচারে দুঃস্থ উপজাতিদের পাশে যে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উপজাতিদের ন্যায্য অধিকারের কথা যে বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি বলেছেন, তার মূল্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ঐতিহাসিক ভূমিকার চাইতে বেশী না হলেও নিশ্চিতভাবে কম নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসনে উপজাতিদের বর্তমান চারটি মূল দাবি হল— এক, শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ করা। দুই, পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়া। তিন, উপজাতিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া। চার, ডিস্ট্রিক্‌ট অটোনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পৃথিবীর সব দেশেই, এমন কি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও উপজাতিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট রক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করে। সেদিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকা উচিত।

যে কোন দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মনে বিশ্বাস ও সংহতির বীজ বুনতে প্রয়োজন সুষ্ঠু জাতীয় নীতি। সুষ্ঠু জাতীয় নীতির অভাবে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত এবং বিলুপ্ত প্রায়। অন্যদিকে সোভিয়েত

ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও জাতীয় নীতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি ও জাতিসত্তা স্বতন্ত্র অথচ বহুর মাঝে ঐক্য ও সংহতির ধারা নিয়ে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে পনেরটি ইউনিয়ন রিপাবলিক, কুড়িটি স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, আটটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং দশটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে আলাদা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দেওয়া হয়েছে আলাদা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। এতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনের বিকাশ ঘটছে নিজস্ব ধারায়। বাংলায় বোকার প্রতিশব্দ হিসেবে 'উজবুক' কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'উজবুক' শব্দটি এসেছে উজবেগ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান উজবেকিস্তান আর জারের আমলের উজবেকিস্তানের ফারাক আকাশ পাতাল। তখনকার উজবেকিস্তানের লোকেরা এত অনুন্নত ও দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল যে, বাইরের লোকেরা তাদের বোকা বলত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুষ্ঠু জাতীয় নীতির ফলে উজবেকরা বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রশ্নটি সেই আলোকে বিবেচিত হতে পারে।

দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজসেবী ও বিরোধী দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানে আগ্রহভরে এগিয়ে আসবে, এটা নিশ্চয়ই উপজাতি জনগণ কামনা করে। কারণ এই সমস্যা শুধু সরকারের কিম্বা উপজাতিদের নয়। এই সমস্যা জাতীয় সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার উত্তরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তর-পূর্বে মিজোরাম এবং পূর্বে বার্মার আরাকান অঞ্চল। এই সব অঞ্চল ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র তৎপরতা দানা বেঁধে উঠেছে। ঘোলা জলে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক চক্র ওৎ পেতে রয়েছে এই সব অঞ্চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংস্থার উনআশির একুশে জুনের এক ঘোষণায় জানা যায়, সেই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (স্টেট ডিপার্টমেণ্ট) মদতে 'প্রজেক্ট ব্রহ্মপুত্র' নামে একটি প্রকল্প নিয়ে ভারতে কাজ চালিয়েছিল এই সংস্থা। উদ্দেশ্য, ভারতের বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা যায় কিনা, তার জন্য জনমত যাচাই করা। তারও আগে, ছেষট্টির সাতই ডিসেম্বরের এজেন্সিয়া ইণ্টারন্যাশনাল ডে প্রেনসা (ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস সার্ভিস)-র এক রিপোর্টে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উত্তর

পূর্বাঞ্চল ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখনও দেখা যায়, বিদেশের কোন পত্রিকা বা বইয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। মানচিত্র অঙ্কনে দৈবাৎ জনিত ত্রুট বলে বাংলাদেশকে ঘিরে পাশ্চাত্য কিছু দেশের দুরভিসন্ধি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই দুরভিসন্ধির উদ্দেশ্য একটাই, উপমহাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিয়ে উন্নয়ন ব্যাহত করা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমেই সাধারণত এই ধরণের ষড়যন্ত্র পেকে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে অনেকগুলো সাহায্য সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। মিলিটারি সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়েই এই সব সংস্থার পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন ঘটেছে। এই সব সংস্থার কাজ প্রধানত দ্বিবিধ। এক, রাস্তাঘাট নির্মাণ, আদর্শ গ্রাম, কৃষি ও পশুপালন খামার গড়ে তুলতে সরকারকে সাহায্য করা। দুই, সরকারের অগোচরে গোপনে সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতিদের উস্কিয়ে দেওয়া। প্রকল্পের পঁচানব্বই শতাংশ কাজ হয়ে যাওয়ার পর অনেক সংস্থা, সরকারের নেওয়া প্রকল্প উপজাতিদের ভাগ্যোন্নয়নে সাহায্য করছে না, এই অভিযোগ তোলে এবং উপজাতিদের নিদারুণ দুর্দশায় কুমিরের কান্না কেঁদে, প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে যাচ্ছে। এতে সাপও মরছে, লাঠিও ভাঙছে না। সংস্থাগুলো যে দেশগুলোর, সেই সব দেশে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মুমূর্ষু অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য নানা ধরণের মানবাধিকার সংক্রান্ত সংগঠন গড়ে উঠছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে ওঠার প্রধান কারণ তেল। তেলের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন কয়েকটি বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক জরীপ চালিয়েছে। এই জেলার তেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলে জরীপের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি সিসমো-গ্রাফিক সারভে লিঃ, ফরাসী কোম্পানি জেনারেল জিওপিজিকস বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যাকে আর্থিক ও সামাজিকগত ব্যবস্থাদির দ্বারা সমাধানের যে পর্যায় ছিল, সেটা অনেকদিন আগেই পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের উদাসীনতা ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের মূল্যায়ন ও ভুল পদক্ষেপে আজ এই সমস্যা শুধু রাজনৈতিক নয়, এমন একটি মানসিক পর্যায়েও গিয়ে

পৌঁছেছে, যার সমাধান কোন রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির দ্বারা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, সরকার যদি আজ কোন ইতিবাচক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে তাহলেও এই পর্যায়ে তার কোন সুফলই পাওয়া যাবে না। কারণ সরকারি কোন ব্যবস্থাকেই উপজাতিরা আর আমল দিতে চায় না। ক্ষতের আসল উপশম ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয়নি। তাই উপজাতিদের জন্য সুষ্ঠু জাতীয় নীতি প্রণয়নে সরকার বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধি ও উপজাতি নেতৃবৃন্দের সমান ভূমিকা থাকা উচিত। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নীতি অনুসারেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব। নিরাপদ আচরণ বিধির প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্তি বাহিনীর উভয় গোষ্ঠির সঙ্গে সমস্যা ও সমাধান নিয়ে অবিলম্বে সরকারের খোলামেলা ও সরাসরি আলোচনার সূত্রপাত করা দরকার।

আশার কথা, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের কোন সরকার যা বলেননি, তা বলিষ্ঠভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেনারেল এরশাদ। সরকারের দায়িত্বভার হাতে নেবার পর তিরাশির তেসরা অক্টোবর খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক এলাকায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে, উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা ও বিকাশ সাধনে উপযোগী হবে এমন একটি 'হিল ট্রাক্টস' ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও তার যথাযত প্রয়োগ করা হবে। উপজাতি নেতৃবৃন্দ ও শান্তি বহিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা সমস্যা কিভাবে নিরসন করা যায়, তা নিয়ে অলোচনায় বসার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন।

দেশে গণতান্ত্রিক সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তবে সুষ্ঠু জাতীয় নীতি প্রণয়ন সম্ভব। সামরিক শাসনের অবসান করতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে রাজপথে নেমেছে দেশের সব কটি বিরোধী দল। জেনারেল এরশাদও বলেছেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। উপজাতি নেতারাও এই আন্দোলনে শরিক হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারেন। সচেতন উপজাতির একটা অংশ মনে করেন শুধুমাত্র সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপজাতি সমস্যার প্রতি দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি ও বাস্তবানুগ সমাধানে তাঁদের উদ্যোগ ও সমর্থন আদায় করা সম্ভব হলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট নিরসনের রাস্তা তৈরি হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সত্যিকারভাবে কি ঘটছে; কেনই বা উপজাতি অসন্তোষ, উপজাতিদেরই বা

দাবিদাওয়া কি, তা দেশের অধিকাংশ মানুষ জানেন না। সরকারি একপেশে ভাষ্য থেকে তাঁরা যা জানতে পারেন, তা থেকে উপজাতি সমস্যা সঠিকভাবে বোঝা শক্ত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, সরকারি অপপ্রচারের ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে যে, অধিকাংশ উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিদ্বেষী। এই ভুল ধারণার অবসান করতে দরকার উপজাতিদের ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং সদর্থক জাতীয় জীবনে নিজেদের সার্থক ভূমিকা খুঁজে নেওয়া। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল উপজাতিদের সমস্যার সমাধান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়সমূহ সঠিক নেতৃত্বের শূন্যতায় ভুগছে। তবে ভরসা, কোন সম্প্রদায় বা জাতি দীর্ঘদিন নেতৃত্ববিহীন থাকে নি। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। উপজাতিদের অনেকে আশা পোষণ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার বেশ কিছু ছাত্র ও তরুণ উপজাতি নেতা ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। এই ধরণের কিছু ছাত্রনেতা সংঘঠিত হয়ে গঠন করেছেন 'ঢাকা ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন'। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার সঠিক চিত্র দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করছে এই সংগঠন, সংগঠনের প্রচার পত্র, সাময়িকী ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। ঢাকা ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গড়ার পেছনে অবদান রেখেছেন সম্ভাবনাময় অনেক ছাত্রনেতা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন দীপেন দেওয়ান, উৎপল দেওয়ান, কল্যাণ মিত্র চাকমা, রূপক খীসা, মং তিং ক্রো, অনুপম চাকমা, কণিকা চাকমা, বুদ্ধি বাহাদুর ও কুলোত্তম চাকমা। উপজাতিদের একটা অংশ ঢাকা ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের কার্যকলাপ আশা ও আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পনের দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ রাজনৈতিক সফরে খাগড়াছড়ি যেতে চেয়েছিলেন। সরকারি বিধিনিষেধের ফলে জনসভায় বক্তব্য রাখা দূরের কথা, তিনি জেলায়ও কোন রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন, দেশে রাজনৈতিক সভাসমিতি নিষেধ নয়। তাহলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন এই কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ? পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কেন আলাদা আইন? সারা দেশের

সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অমিল কোথায়? তাহলে, শান্তি বাহিনীর উগ্রপন্থী অংশের দাবি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড নয়—এ্যানেক্স, কী সত্যি? পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসভা ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর সরকারের নিকট কড়া প্রতিবাদ জানানো উচিত। জানা উচিত কেন এই বৈষম্য? দেশের রাজনৈতিক হাওয়া এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহকে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে জাতীয় মূলস্রোতের ভাবধারার সঙ্গে মেলানোর পক্ষে অনুকূল। পনের ও সাত দলীয় ঐক্যজোট উপজাতি ইস্যুর ওপর পরিষ্কার বক্তব্য ও সঠিক পদক্ষেপ নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ইতিহাসের দায়। সেই দায়-দায়িত্ব পালনের ভার রাজনৈতিক পরম্পরাগতভাবে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হাতে এসেছে। ইতিহাসের এই দায় সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে ফেলতে বা পালনে এলোমেলো বা গোঁজামিল নীতি অনুসরণের অবকাশ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, উপজাতি সম্পর্কিত সব দায়-দায়িত্ব সরকার ছেড়ে দিয়েছে কয়েকজন আমলার হাতে। বাংলাদেশের প্রথম সরকার থেকে আজ অবধি কোন সরকারেরই উপজাতি সমস্যা দেখাশোনা করার জন্য র'জনৈতিক কমিটি নেই। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক কমিটি যদি গঠিত হত, তাহলে আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা বর্তমানের সঙ্কটরূপে ধারণ করত না।

রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোকাবেলা রাজনৈতিক চমক নয়, রাজনৈতিক ভাবেই হওয়া প্রয়োজন। মূল সমস্যা এড়িয়ে ও জিইয়ে রাখলে কোন সমস্যার বস্তুত সমাধান সম্ভব নয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কারণ অস্ত্র সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ণ কমিটির
নিকট
পার্বত্য-চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবীর
আবেদন পত্র

—::—

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক অধিকার যাতে গৃহীত হয়, তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ ইংরেজী তারিখে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এই স্মারকলিপিখানি মনে প্রাণে সমর্থন করি এবং গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে "নবজীবনের প্রতীক্ষায়" রয়েছি।

স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত "চারিটি বিষয়" উত্থাপন করা হয়েছে:

"১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির" ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩। উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।"

স্মারকলিপিতে বর্ণিত "চারিটি বিষয়" যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী, তজ্জন্য আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি। এক কথায় বলতে গেলে "চারিটি বিষয়" হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চাবিকাঠি: নিজস্ব আইন পরিষদ সহ একটি স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চলে

পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করার জন্য আমরা আমাদের দাবী উত্থাপন করেছি। বছরকে বছর ধরে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ আমলের দিন থেকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ধ্বংসের দিন পর্যন্ত আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা খুবই দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছি; যার ফলে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল (Excluded Area)। কিন্তু ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশে "উপজাতীয় জনগণের আবাসভূমি" হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল তথাপি বাস্তবে ইহা মিথ্যা এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে রাখার জন্য শাসনের সুবিধার্থে আইন প্রয়োগের জন্যে ১৯০০ সালে ব্রিটিশ সরকার "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি" ঘোষণা করেন। এই শাসনবিধি পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসনবিধি একটি অগণতান্ত্রিক শাসনবিধি। এই শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশের গভর্ণরের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে এই শাসনবিধি দ্বারা। গভর্ণর খুবই ক্ষমতাশালী। তিনি যে কোন সময়ে যখন মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশাসন ও শান্তির পক্ষে ইহা প্রয়োজন, উপযোগী এবং উপযুক্ত, তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন প্রয়োগ কবেন, নতুন রুলস ও রেগুলেশন বাতিল করেন। তিনি এতোই শক্তিশালী যে স্বেচ্ছামূলকভাবে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন। তিনি কোনও আইন পরিষদের নিকট জবাবদিহি হতে বাধ্য নন। গভর্ণর হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ। গভর্ণর আইন প্রণয়ন করেন এবং তার জেলা প্রশাসন ইহা কার্যকরী করেন। ফলে পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সর্বক্ষেত্রে আগের মতো পার্বত্য চট্টগামের জনগণ পিছিয়ে পড়ে থাকলো।

ব্রিটিশ সরকার আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। জনগণের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি অদ্ভুত অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করে। জনগণ গভর্ণর ও তার প্রশাসনের দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত করে ব্রিটিশ সরকার বাইরের মানুষকে প্রশাসন বিভাগে নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন কার্য্য চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে কালক্রমে বহিরাগতদের প্রভাব

জেলা প্রশাসনে প্রাধান্য লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ বাজার, নদী বন্দর প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসায়ী কেন্দ্র সমূহ বহিরাগতদের হাতে চলে যায়। এইরূপে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জেলা প্রশাসন থেকে চ্যুত হয় এবং দূরে সরে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়, অর্থনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় পাকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য জনগণকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসেননি। বরঞ্চ পক্ষান্তরে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে লুপ্ত করে দিবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। অন্যায় অবিচার সমগ্র জেলায় চরম নৈরাশ্য ও ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯ হাজার ৯ শত ৭৭ জন মানুষ ১৯৬০ সালে গৃহহারা, জমি হারা হয়ে যায়। সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেনি। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই না করে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে ঘুচিয়ে দিবার জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রতিবাদ করতে পারেনি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে জন্মভূমি চিরতরে ত্যাগ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ১৯৬৪ সালে ভারতে আশ্রয় পাবার আশায় সীমান্ত পাড়ি দেয়।

বেআইনী অনুপ্রবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ৯৪·৪৭% অমুসলমান ২·৫৯% এবং মুসলমান ২·৯৪%। মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার কিছু অংশ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম বাসিন্দা আর বাদবাকী অংশ ছিল বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু গত চব্বিশ বছরে বহিরাগতের সংখ্যা অসম্ভবরকম ভাবে বেড়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বারবার পাকিস্তান সরকারকে এই বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। বহিরাগতদের দ্বারা বেইআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখল তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি" অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনও রকমের বন্দোবস্তী বহিরাগতদের জন্য

নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গভর্ণর এবং তার জেলা প্রশাসন এই শাসনবিধিকে কার্যকরী করেনি। পক্ষান্তরে গভর্ণর এবং তার জেলা প্রশাসন বহিরাগতদেরকে বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখলের পথ নীরবে খুলে দেয়। "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি" বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেনি, পারেনি বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখল বন্ধ করে দিতে। এই শাসনবিধি অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা জনগণের যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে পড়ে থাকার অবস্থার কোনও পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি। কালক্রমে এই পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নিকট অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা যথেষ্ট নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না। এই জন্যই আমরা "চারিটি বিষয়" উত্থাপন করে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত একটি আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তুলে ধরেছি। সুতরাং—

ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে, এরকম শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঘ) আমাদের জমি স্বত্ব—জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

আমাদের দাবী ন্যায় সঙ্গত দাবী। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।

ভারত তার বিভিন্ন জাতিসমূহের সমস্যাসমূহ সমাধান করেছে। ভারতের

জাতিসমূহ—বড় বা ছোট সকলে শাসনতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে। ভারতের জাতিসমূহ ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য পর্য্যায়ের মর্যাদার অধিকারী হতে চলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও তার জাতিসমূহের সমস্যার সমাধান করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সকল জাতিসমূহকে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দিয়েছে এবং গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্বশাসিত রিপাব্লিক, স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় অঞ্চলে বিভক্ত করে জাতিসমূহের সমস্যার সমাধান করেছে।

পাকিস্তান সরকার আমাদিগকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে। গত চব্বিশ বছর আমরা সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা আগের মতো পিছিয়ে পড়ে রয়েছি। এখনও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অর্দ্ধ নগ্ন পরিবেশে বাস করছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ আ'দিম যুগের পরিবেশে বাস করছে।

এখন নিপীড়নকারী, স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের দিন আর নেই। আমরা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সর্বরকমের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছি। আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। উপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ চারিটি মূলনীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে উর্দ্ধে তুলে ধরে উজ্জল ভবিষ্যত নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের জনগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।

জয় বাংলা!

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

গণ পরিষদ সদস্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলা দেশ

এবং

আহ্বায়ক,

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

তারিখ—রাঙামাটি,
২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২ সন।

THE CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION, 1900

CONTENTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

CHAPTER II

LAWS

CHAPTER III

APPOINTMENT AND POWERS OF CERTAIN OFFICERS

CHAPTER IV

ARMS, AMMUNITION, DRUGS AND LIQUOR

12. Daos, spears and bows and arrows.
13. Intoxicating drugs.
14. Foreign spirit and fermented liquor.
15. Locally made spirit and fermented liquor.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

16. Police
17. Control and revision
18. Power to make rules
19. Bar to jurisdiction of Civil and Criminal Courts.
20. Repeal of certain enductments.

THE SCHEDULE

ENACTMENT DECLARED IN FORCE IN THE CHITTAGONG HILL TRACTS

APPENDIX A

A

REGULATION

TO

Declare the law applicable in and provide for the administration of the Chittagong Hill Tracts in Bengal.

Whereas it is expedient to declare the law applicable in, and provide for the administration of, the Chittagong Hill Tracts in Bengal, It is hereby enacted as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. This regulation may be called the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900

Short title, extent and commencement

(2) It extends to the Chittagong Hill Tracts, and

(3) It shall come into force on such date as the Local Government may, by notification in the Calcutta Gazette, appoint.

Definition :

2. (1) In this Regulation—

(a) The expression "Chittagong Hill Tracts" means the territories for the time being defined as such by notification under sub-section (2) and

(b) "Commissioner" means the Commissioner of the Chittagong Division.

(2) The Local Government may with the previous section of the Governor-General in Council, by notification in the Calcutta Gazettee. define the boundaries of the Chittagong Hill Tracts, and may, in the like manner, vary those boundaries.

CHPTER II

LAWS

Chittagong Hill Tracts how to be administered.

3. Subject to the provisions of this Regulation, the Administration of the Chittagong Hill Tracts shall be carried on in accordance with the rules for the time being in force under section 18.

Enactments applicable in Chittagong Hill Tracts.

4. (1) The enactments specified in the schedule, to the extent and with the modification therein set forth and so far as they are not inconsident with this Regulation or the rules for the time being in force thereunder, are hereby declared to be in force in the Chittagong Hill Tracts.

(a) No other enactment herefore or hereafter passed shall be deemed to apply in the Chittagong Hill Tracts.

Provided that the Local Government, may with the previous sanction of the Governor-Genral in Council, by notification in the Calcutta Gazettee,—

(a) declare that any other enactment shall apply in the said Tracts, either wholly or to the extent or with the modifications which may be set forth in the notification ; or

(b) declare that any enactment which is specified in the schedule, or which has been declared to apply by a notification under clause (a) of this sub-section, shall cease to apply in the said Tracts.

CHAPTER III

APPOINTMENT AND POWERS OF CERTAIN OFFICERS

Appointment of Superintendent and subordinate officers.

5. The Local Government may, by notification in the Calcutta Gazettee,—

(a) appoint any person to be the Superintendent of the Chittagong Hill Tracts ; and

(b) appoint so many Assistant Superintendents and other officers as it thinks fit to assist in the administration of the said Tracts.

Invetment of Assistant Superintendents with powers of Superintendent.

6. The Local Government may by, notification in the Calcutta Gazettee, invest any Assistant Superintendent with all or any of the powers of the Superintendent under this regulation or the rule, for the time being in force thereunder, and define the local limits of his jurisdiction.

Chittagong Hill Tracts to be a district under the Superintendent.

7. The Chittagong Hill Tracts shall constitute a district for the purposes of criminal and civil jurisdiction and for revenue and general purposes, the Superintendent shall be the District Magistrate, and subject to any orders passed by the Local Government under section 6, the General Administration of the said Tracts in criminal, civil, revenue and all other matters, shall be vested in the Superintendent.

Chittagong Hill Tracts to be sessions division under the Commissioner.

8. (1) The Chittagong Hill Tracts shall constitute a sessions division, and the Commissioner shall be the Sessions Judge.

(2) As Sessions Judge the Commissioner may take cognizance of any offence as a Court of original jurisdiction, without the accused being committeed to him by a Magistrate for trial, and when so taking cognizance shall follow

the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1898, for the trial of warrante-cases by Magistrates.

High Court.

9. The Local Government shall exercise the powers of a High Court for the purpose of the submission of sentences of death for confirmation under the code of Criminal Procedure, 1898, and the Commissioner shall exercise the powers of a High Court for all other purposes of the said Code.

Power to withdraw cases.

10. The Superintendent may withdraw any criminal or civil case pending before any officer or Court in the Chittagong Hill Tracts, and may either try it himself or refer it for trial to some other officer or court.

CHAPTER IV

ARMS, AMMUNITION, DRUGS AND LIQUOR

Possession of firearms and ammunition, and manufacture of gunpowder.

11. (1) The superintendent may fix the number of firearms and the quantity and description of ammunition which may be possessed by the inhabitants of any village, and may grant permission either to such inhabitants collectively or to any of them individually, to possess such firear and ammunition as he may think fit.

(2) All firearms for the possession of which permission is given under sub-section (1) shall be marked and entered in a register.

(3) Any permission granted under sub-section (1) to possess firearms and ammunition may be withdraw by the Superintendent, and thereupon a firearms and ammunition referred to in such permission shall be delivered to the Superintendent or one of his subordinates.

(4) The Superintendent may grant permission to any person to manufacture gunpowder, and may withdraw such permission.

(5) Whoever, without the permission of the Superintendent, possesses or exports from the Chittagong Hill Tracts any firearms or ammunition, or manufactures any gunpowder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(6) The Superintendent may, with the previous sanction of the Local Government, by order in writing, direct that sub-sections (1) (2), (4) and (5), or any of them, shall not apply in any village specified in the order.

Daos, spears and bows and arrows

12. (1) The Superintendent may, with the previous sanction of thc Commissioner, by order in writing prohibit all or any of the inhabitants of any village from carrying daos, spears and bows and arrows, or any of those weapons, in any tract to be denfied in the order, if he is of opinion that such prohibition is necessary to the peace of such tract.

(2) Every order made under sub-section (1) shall specify the length of time during which it shall remain in force.

(3) Whoever disobeys an order made sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

Intoxicating drugs

13. (1) Whoever, except under and in accordance with licence granted by the Superintendent imports, exports, manufactures, possesses or sells opium, ganja or charas, or any preparation thereof or cultivates any plant from which opium, ganja or charas can be produced, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) any person may possess, for domestic use, five tolas of opium, ganja, or charas, or of any preparation, thereof, without having a licence granted by the Superintendent.

14. (1) Whoever, except under and in accordance with a licence granted by the Superintendent, imports or sells foreign spirit or fermented liquor shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three moths or with fine, or with both,

Foreign spirit and fermented liquor

(2) Nothing in this section applies—

a) to the import by any person, for his private use and consumption, and not for sale, of any foreign spirit or fermented liquor on which duty has been paid ; or

b) to the sale of any such spirit or liquor legally procured by any person for his private use and consumption and sold by him, or by auction on his behalf, or on behalf of his representatives in interest, upon his quitting a station or after his decease.

Explanation—For the purposes of this section, the expression "foreign spirit or fermented liquor" means any spirit or fermented liquor not manufactured or produced in the Chittagong Hill Tracts.

15. Whoever, except under and in accordance with a license granted by the Superintendent, exports or sells spirit or fermented liqnor manufactred or produced in the Chittagong Hill Tracts shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Locally made spirit and fermented liquor

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

16. The Chittagong Hill Tracts shall be deemed to be a gereral police-district within the meaning of the Police Act, 1861, and Bengal Act VII, v of 1851, of 1869 (an Act to amend the constitution of the Police-force in Bengal and the Commi-

Police

ssioner shall exercise therein all the powers and authority conferred on an Inspector-General of Police.

17. (1) All officers in the Chittagong Hill Tracts shall be subordinate to the Superintendent, who may revise any order made by any such officer, including an Assistant Superintendent invested with any of the powers of the Superintendent under section 6.

Control and revision

(2) The Commissioner may revise any order made under this Regulation by the Superintandent or by any other officer in the Chittagong Hill Tracts.

(3) The Local Government may revise any order made under this Regulation.

18. (1) The Local Government may make rules for carrying into effect the objects and purpose of this Regulation.

Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

a) provide for the administration of civil justic in the Chittagong Hill Tracts ;

b) prohibit, restrict or regulate the appearance of legal practitioners in cases arising in the said Tracts ;

c) provide for the registration of documents in the said Tracts ;

d) regulate or restrict the transfer of land in the said Tracts ;

e) provide for the subdivision of the said Tracts into circles, those circles into taluks, and those taluks into mauzas ;

f) provide for the collection of the rents and the administration of the revenue generally in the said circles, taluks and mauzas through the chiefs, diwans and headmen ;

g) define the powers and jurisdiction of the chiefs, diwans and headmen, and regulate the exercise by them of such powers and jurisdiction ;

h) regulate the appointment and dismissal of diwans and headmen ;

i) provide for the remuneration of chiefs, diwans, headmen and village officers generally by the assignment of lands for the purpose or otherwise as may be thought desirable ;

j) prohibit, restrict or regulate the migration of cultivating raiyats from one circle to another ;

k) regulate the acquisition by Government of land required for public purposes ;

l) provide for the levy of taxes in the said Tracts ; and

m) regulate the procedure to be observed by officers acting under this Regulation or the rules for the time being in force thereunder.

(3) All rules made by the Local Government under this section shall be published in the Calcutta Gazette and on such publication, shall have effect as it enacted by this Regulation.

Bar to jurisdiction or Civil and Criminal Courts

19. Except as provided in this Regulation or in any other enactment for the time being in force, a decision passed, act done or order made under this Regulation or the rules thereunder, shall not be called in question in any Civil or Criminal Court.

Repeal of certain enactments

20. Act XXII of 1860 (an Act to remove certain tracts on the eastern border of the Chittagong District from the Jurisdiction of the tribunals established under the general Regulations and Acts) ; Bengal Act IV of 1863 (an Act to amend Act XXII of 1860) and so much of the second schedule to the Scheduled Districts Act, 1874 and of the Repealing and Amending Act, 1891, as relates to either of the enactments aforesaid, are hereby repealed.

xiv of 1874
xii of 1891

POLITICAL DEPARTMENT.

NOTIFICATION NO. 123 P.D.

The 1st May 1900.—In exercise of the Power conferred on him by section 18 of the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900, the Lieutenant-Governor is pleased to lay down the following rules for the administration of those Tracts :—

RULES FOR THE ADMINISTRATION OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

ADMINISTRATION OF CIVIL JUSTICE

The administration of civil justice shall be conducted in the most simple and expeditious manner compatible with the equitable disposal of the matters or suits.

2. The officer dealing with the matter or suit will, in the first instance, endeavour, upon the viva voce examination of the parties, to make a just award between them. Witnesses should not be sent for, except when the officer is unable without them to come to a decision upon the facts of the case.

3. The record shall contain the following particulars, namely, the name of the plaintiff, the name of the defendant, the nature of the claim or other matter in litigation, an abstract of the plaintiff's case, an abstract of the defendant's case an abstract of the deposition of the witnesses (where witnesses are examined), the ground of decision, and the order signed and dated.

4. Court fees shall not be levied in any matter or suit.

5. For the service of process fees shall be payable at the rate of six annas per diem, according to the number of days the journey takes from the nearest police station.

6. In the issue and enforcing of processes and the execution of decrees, the officers shall be guided, as far as may be, by the provisions of the Code of Civil procedure.

XIV of 1882

In the case of processes and decrees received from Cou'ts of other districts, the following rules shall be ob'erved :—

1. The Superintendent shall serve all processes and execute all decrees which are sent to him for service or execution by Civil Courts outside the Chittagong Hill Tracts, Courts, and which are accompanied—

a) by an English letter explaining, in the cases of a process, the nature of the suit and forwarding, in the case of a decree, a copy of the judgment ; and

b) by the fees prescribed by the High Court.

2. In any case in which, owing to beat-hire or the carriage of ratinos or similar causes, the cost of service or execution will exceed the fees received, the Superintendent will stay service and will state cost of the Civil Court concerned, and request that the requisite amount be fo:warded.

3. In any case in which the Superintendent finds that the process should not be served, or that the decrees should not be executed, he will record his reasons for so finding, and will at the process or decree and fees till final orders are passed.

4. In either of the cases provided for by rules (2) and (3), the Civil Court concerned may refer the Superintendent's orders directly to the Commissioner of Chittagong, and the Commissioner shall pass orders on such reference and communicate them directly to the Civil Cort concerned. If any Civil Court desires to make a reference from the Commissioner's orde s, such reference shall be addressed to the District Judge for the orders of Governement.

5. The Superintendent will serve the processes and execute the decrees referred to in these rules by the agency of his nazir or of the circle chiefs, or of the registered headmen,

according to the rank and status of the person on whom the process is to be employed in such service or execution except to convey the sealed orders to the agent selected for service or execution.

6. The Sperintendent will in every case report on the service of the process to the Civill Court concerned, and, as regards the execution of decrees, will keep up communication with such Court till the case is disposed of.

7. The rate of interest decreed by the Courts shall in no case exceed 12 per cent. per annum.

8. Deeds which must be registered under the rules following for the registration of deeds shal not be allowed to be filed in any suit unless they have been duly registered.

9. Suite shall be admitted only on registered bonds in all cases in which registration would be compulsory if the transactions out of which the claims arise were completed by the execution of bonds.

10. All orders passed in civil suits shall be appealable to the Commissioner, who may decide by whom the costs in any such appeal shall be paid.

LEGAL PRACTITIONERS AND AGENTS.

11. No legal practitioners shall be permitted to appear in any matter ; and, *in all cases where the Chiefs are personally* concerned, they are, as far as possible, to be personally dealt with. Agents are only to be allowed when the personal presence of the Chife is inconvenient and impracticable, and they must not be legal practitioners.

REGISTRATION OF DEEDS.

12. Deeds of the following kinds shall be registered, provided that the porperty to which they relate is situated, or the work or act to which they relate is to be performed within the Chittagong Hill Tracts—

A—Deeds of sale, gift, partition, or mortgage of immoveable property.

B—Leases of immoveable property for any term exceeding one year.

C—Bonds, Promissory notes, and engagements for the payment of money.

D—Engagements or contracts for the delivery of produce or goods of any kind or for work to be done.

E—Wills and authorities to adopt.

F—Certificates of discharge of mortgage.

G—Deeds of appointing a manager of any estate or property.

13. Deeds not included in the above list may or may not be registered and they will not be inadmissible in Court by reason of non-registry.

14. No engagement to do anything illegal, immoral, contrary to public policy or manifestly impossible, will be registered.

15. If any document duly presented for registration is in a language which the Registering Officer dose not understand, and which is not commonly used in the district, be shall refuse to register the document, unless it is accompanied by a true translation into a language commonly used in the district, and also by a true copy.

16. It shall be in the discretion of the Registering Officer to refuse, to accept for registering any document in which any blot, interlineation, blank, erasure, or alteration appears, unless the person executing the document attest, with their signatures or initials such blot, interlineation, blank, erasure or alteration; and it shall be his duty, at the time of registration the document, to make a note in the register of such interlineation, blank, erasure or alteration.

17. No instrument relating to immoveable property shall be accepted for registration unless it contains a description of such property sufficient to identify the same.

18. No deed, other than a will or authority to adopt, shall be accepted for registration if not presented to the proper officer within three months of its execution, unless good cause for the ommission be shown to the satisfaction of such officer,

in which case if the dealy in presentation does not exceed four months, the deed may be registered on payment of four times the ordinary fee.

19. Any will or authority to adopt may be registered at any time.

20. The functions of the Registering Officer shall be performed by the Superintendent or by such other officer as the Local Government may appoint for the purpose.

21. Every document to be registered shall be presented by some persons claiming under or executing the same; but no document shall be registered unless the persons executing it or their representatives or assigns or agents (where agents are recognised under rule 22) appear before the Registering Officer and admit the execution. Any person refusing to attend when sent for by the Registering Officer, or refusing to take oath, or answer questions put, or sign statements made by him, or making any false statement to the Registering Officer; shall be punishable under the Indian Penal Code.

XIV of 1800

22. Agenst will, as a general rule, be allowed to conduct registration only in behalf of (1) Hill Chiefs and persons of high rank, (2) European gentlemen, and (3) parda-nashin women. Only agents who are of known responsibility, and are personally acquainted with the facts of the case, will be permitted to conduct registration.

23. A fee, as follows, must be paid before registry :—

	Annas
For lease to a cultivating raiyat........	2
For any deed under heading A in rule 12....	8
For any deed under heading C in rule 12 when the liability incurred is less than Rs. 50	2
For the same when liability is not less than Rs. 50 or more than Rs. 300	4

For the same when the liability is inefinite or is more than Rs. 300	8
For engagements under heading D in rule 12 when the period embraecedis not more than three months	4
For the same when the period is indefinite or is more than three months	8
For any deed under heading E in rule 12	8
For any deed under heading F in rule 12	4
For any deed under heading G in rule 12	8
For all othtr deeds, including those registered under rule 13 of these rules	8

24. Persons may be allowed to inspect the books in which deeds are copied, or to take a copy of a deed on payment, in advance of a fee of eight annas, besides any necessary charge for copying.

25. The registering officer will, before he registers a deed, satisfy himself that the parties appearing before him are really those whom they prefers to be, and that they clearly understand the nature and purport of the deed.

26. He shall then record on the deed endorsement in the following form :—

At (the hour) on this (the date, month and year) , AB, son of , resident of and E F., son of resident of , recongised by me (or) duly indentified by H., resident of , appeared before me and acknowledged their execution of this deed and satisfied me that they fully understood its purport.

27. The deed, with the endorsement, shall then be copied without delay into a book previously paged and signed by the Registering Officer. The copy shall be attested by the register-

ing officer, and the original shall then be returned to the party entitled to receive it.

28. The Registering Officer shall keep in a separate book a memorandum, inorder of date of all deeds registered and refused registry, as follows :—

Date of registry or refusal of registry	In what book and in what page registered or for what reasnos registry was refused	Names and residence of parties	Nature and date of deed
1	2	3	4

29. When a register into which deeds have been copid is filled up, an alphabetical index of the parties to the deeds it contains shall be appended to it.

30. All actual and necessary expenses connected with registration shall be defrayed from the fees realised, and any surplus is not required for that purpose shall be disposed of as the Government shall from time to time direct. A regular account of receipts and expenditure shall be kept by the Registering Officer and submitted to the Commissioner for approval and countersignature once a quarter.

31. The definitions of the words "lease" "moveable property" and 'immoveable property" which 1. III of 1877. are contained in the Indian Registration Aet, 1877, shall be held applicable to these rules and to deeds registered under them.

32. The registry book shall be inspected and countersigned by the Commissoner as often as may be found convenient.

33. In any case where registration is refused on the ground that the party who is said to have executed the deed denies his having done so, any party claiming under the deed may sum sue in the Court of the Superintendent within three months of the order of refusal for a declaration of his right to have the deed registered. The Registering Officer shall be no party to such suit, and a copy of his orders of refused, properly attented shall be primafacie proof that the reasons of refused to register was as therein described. The document in dispute shall be admissible as evidened in this suit, anything in those rules contained notwithstanding.

THE LAND.

TRANSFERS, PARTITIONS, AND SUB-LETTING.

34. All lands held for pluogh cultivation on lease from Govt. under whatever rules they have been or may be granted, are subject to the conditions that they cannot be sub-let or transferred exept on hereditary succession or with the consent of the Commissioner. No partition can be made without the consent of the Commissioner. For a tenant to temporarily make over his holding in another person in the case of illness, incapacity, minority, absence as a journey or in the like exigency, is not to sub-let; but in no such case can the tenant recover from his snbstitute or trustee a higher rent he has himself to pay.

CIRCLE DIVISIONS.

35. The Chittagong Hill Tracts comprise the following circles the boundaries of which are well known and are not in dispute—

(1) the several Government forest reserves ;

(2) the Bohmong's circle, including the tract hitherto known as "Sungoo Subdivisional khas Mahal".

(3) the Chakma Chief's circle, including the tract hitherto known as "Sodar Subdivisional khas Mahal",

(4) the Mong Chief's circle.

TALUK DIVISIONS.

36. The 33 blocks which were formed in 1890 the census of 1891 have been constituted permanent divisions and are called taluks. They lie as follows in the three circles :—

Bohmong's circle....18 blocks,
Chakma Chief's circle...9 "
Mong Chief's circle....6 "

MAUZAS.

37. The taluks are subdivided into mauzas. A mauza will ordinary contain not less than one and a half and not more than 20 square miles, including hill, wood and waste. Wherever there is plough cultivation, a mauza will be formed, and its external boundaries laid down on the map. Wherever there is a permanent village, even without plough cultivation, a mauza will be similarly formed. The remaining mauzas will be formed as circumstances allow, and, till defined will be known as the undefined mauzas.

ADMINISTRATION OF THE CIRCLES AND MAUZAS.

38. The three Chiefs—the Chakma Chief, the Bohmong, and the Mong Chief—are charged with the administration of the respective circles, and every persons residing or cultivating within a circle is subject to the jurisdiction of its chief, with the exception of Government Officers and their families, traders and shopkeepers in bazar and leases of fisheries and *garjan kholas.*

The existing headmen are in charge of the administation of the mauzas. Where they are wanted headmen will be

appointed by the Superintendent in consultation with the Chiefs and the inhabitants of the mauzas. Every person, with the exceptions aforesaid, residing or cultivating within a mauzas will be subject to the authority of its headman.

COLLECTION OF THE RENTS.

39. The rents in each mauza will be paid to the headman. Every householder residing or cultivating within a mauza is liable to pay rent to the headman, and there may be no remission of that liability, unless sanctioned by the superintendent. The headman will collect rents under the control and authority, of the Circle Chiefs. The Chief and the headman will receive commission on the collections at such rates, respectively, as may from time to time be sanctioned by the Government.

ADMINISTRATIVE POWER OF THE CHIEFS AND HEADMAN.

40. Except in the cases mentiond at the end of this rule, the Chiefs will regulate the affairs of their circles and the action of the headman within them, with powers of fine of enforcing restitution, and of imprisonment. Similarly, the headman will regulate the internal affairs of their mauzas, with powers of fine up to Rs. 25, of enforcing restitution, and detention till the Superintendent's orders are received. The Superintendent will have general revisional jurisdiction over the exercise of all these powers, and will continue to receive from the police information of the occurrence of cases.

EXCEPTED CASES REFERRED TO ABOVE.

(1) Offences againt the State, against Government Servents, against public justice.

(2) Riots in which grievous hurt has been caused or deadly weapons have been used.

(3) The following serious offences against the person, namely, murder, culpable homicide, voluntarily causing

grievous hurt, wrongful confinement, rape, abduction, kidnapping, and unnatural offences.

(4) Extention, robbery, dakaity, lacking house-trespass, or house-breaking when the property taken exceeds Rs. 500 in value.

(5) Forgery.

(6) Offences under Chapter IV of the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900.

(7) Any case or class of cases which the Commissioner may specify in this behalf.

THE RENT.

41. The rent is of four kinds, viz—

(i) the existing *joom rent and begar* ;

(ii) the plough cultivation rent ;

(iii) ground-rent for premises used for other than agricultural purposes (shops etc.)

(vi) the grass and *garjan khola* rent.

JOOM RENT AND BEGAR.

42. (a) Every joomia, who has by custom to pay joom rent, must pay the joom rent for the Government to the Chief in whose circle he resides, to be collected by the headman without in whose mauza he resides. If any such joomia jooms in a different circle or mauza from that in which he resides, he must, in the case of a different circle, pay the full joom-tax, for that joom in addition to what he has to pay to his Circle Chief ; and in the case of a different mauza in the same circle, he must pay half the full joom rent to the headman of that mauza in addition to the full rent which he has to pay to his own headman. Plough cultivation gives no exemption from joom-tax to a man who jooms.

(b) The joom book must show separately the jooms and joom-tax for each mauza.

THE PLOUGH RENT.

43. The gazatted officers of Government, the Circle, and the

headman may grant to any suitable person wishing to open plough cultivation the requisite authority to do so, specifying the Terms.

The plough rent will be collected by the headman under the control, and Superintendence of the Chief, and it may be paid direct to the Government Officers or through the Chief, as is found most convenient in different cases. The headman may assign to any suitable raiyat as much land as it is within the raiyat's power to cultivate himself. For the first three years it will be rent-free. Thereafter it will be assessed by the Superintendent and the rate once fixed will not be assessed altered for 10 years. The headman will frame a rent-roll (*jamabandi*) for all plough cultivation in his mouza, which, when revised by the Superintendent will form the basis of the demand. These rent-rolls will be examined, when possible on the spot every year. Pluogh cultivation held under leases will, when not forfeited, be included in the rent-roll on the terms of the lease. When the lease corditions have been violated, the lease will be cancelled and the land settled with the actual cultivator as if no lease had been given.

NON-AGRICULTURAL RENTS AND BAZARS.

44. The rents for non-agricultural sites will be fixed by the Superintendent, and when so fixed, will be entered on the rent-roll and distributed in the same way as the plough cultivation rent. But this rule does not apply to the cases of bazars, which may be separated by the Superintendent from the mauza and settled by him, and managed either through the headman or direct, as he sees fit.

GRASS AND GARJAN KHOLA RENTS.

45. The grass kholas, excepting how grass kholas which may come into existence within the boundaries of mauzas (Bengal Government No. 2544P. dated 9th December 1902), will be settled by the Superintenednt as hitherto, either yearly or for periods of not more than 10 years in any case, and when settled, their rents will be realised separately and will not be

added to the rent-roll or distributed like the rents for pluogh cultivation and non-agricultural sites.

SERVICE LANDS.

46. In every mauza 50 acres of the best arable land, in one block or in area or areas as nearly approaching 50 acres as may be practicable, will be demarcated, recorded and set apart as the khas land of Government for the remunerations of the village officials, the headman, the patwari or karbari if there is one, and the watchmen, if such are appointed, and will be assigned to such officers by the Superintendent to hold rent-free during their continuance in office. No headman may hold, as his remuneration more than 5 acres of the land, but the rent of it while unoccupied, may be placed in his charge under such temporary arrangements as the Superintdenent seem fit to make. No officer shall have an indefeasible right to transfer such land, or to receive from the Government or from his successor any compensation for improvements made on the land; but the Commissioner may require a newly appointed officer to pay to his predecessor reasonable compensation for unexhausted improvements.

KHAS MAUZAS OF CHIEFS.

47. With the sanction of the Commissioner, a circle chief may hold one or more mauzas in his circle as his khas mauza or mauzas, and in that case will be entitled to all the remuneration provided for the headman in addition to his remuneration as chief, so long as he arrange properly for the performance of the duties of the headman and the mauza officers.

INVESTITURE OF THE CHIEFS AND APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEADMAN.

48. The investiture of the chiefs is regulated by the Bengal Government. The headman will be appointed by the Superintendent, in consultation with the chiefs and the inhabitants of the mauzas ; they may be dismissed by the Superintendent for misconduct or incompetence after a reference to the chief concerned. The Superintendent will not be bound in either case

by the wishes of the Chief, the full consideration should be given to them. This appointment is not hereditary ; but a son, when competent, may by appointed to succeed his father.

MIGRATION AND MIGRATING DEFAULTERS ABSCONDERS.

49. Migration by cultivating raiyats from one circle to another, though not absolutely prohibited is to be discouraged.

No cultivating raiyat may so migrate till he has discharged all dues owed by him within the circle and mauza from which he wishes to migrate; and the Chief and the headman are empowered to detain the persons and property of such intending defaulters till the order of the Superintendent are received. An absconder will never be permitted to resettle within the circle from which he has absconded till he discharges all the dues for which he was liable when he absconded.

LANDS REQUIRED FOR PUBLIC PURPOSES.

50. Arable land may not be settled by the headmen so as to interfere with roads or paths, or the public convenience or the requirements of Government. and any settlements made in contravention shall be summarily cancelled. When land, for which a settlement has been sanctioned, is required by Government, it will be resumed on payment of compensation.

J. A. Bourdillon,

Offg. Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

সুত্র

১। অগ্‌গবংশ মহাথের—স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১।

২। অগ্‌গবংশ মহাথের, মাই আপীল টু দি ইউনাইটেড নেশনস্., ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইণ্ডিজেনাস পপুলেশনস্., জেনিভা, ১লা আগষ্ট, ১৯৮৪।

৩। অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, শঙ্খ প্রকাশন, ১৯৭৩।

৪। অমৃত বাজার পত্রিকা, ট্রাইবেল ম্যাসাকর ইন চিটাগাং, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, কলকাতা।

৫। অষ্ট্রেলিয়া সরকারেব চিঠি, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৮০।

৬। আবুল মনসুর আহ্‌মেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নজরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৭। আতিকুল আলম, বাংলাদেশ শুট অন সাইট বিল, দি গার্ডিয়ান, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮১, লণ্ডন।

৮। আনন্দ বাজার পত্রিকা, চট্টগ্রামে উপজাতি হত্যা, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, কলকাতা।

৯। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৫ হাজার চাকমা মিজোরামে ঢুকেছে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, কলকাতা।

১০। আলমুট মে, দি ইকনমি অব শিফটিং কালটিভেসন ইন বাংলাদেশ, মাইমেও পেপার, বার্লিন, এফ. আর. জি., ১৯৭৮।

১১। এ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, লণ্ডন।

১২। এ. এল. খাতিব, হু কিলড মুজিব, বিকাশ পাবলিশিং, নয়া দিল্লী, ১৯৮০।

১৩। এ্যান্টনি ম্যাসকারেন্স, রেপ অফ্ বাংলাদেশ, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লী, ১৯৭১।

১৪। এ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্যাশানাল রিপোর্ট, বাংলাদেশ, রিসেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস এণ্ড এ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্যাশনাল কনসার্ণ, ৫ঠা নভেম্বর, ১৯৮০।

১৫। এ. কে. দেওয়ান, ক্লাশ এণ্ড এথ্‌নিসিটি ইন দি হিল্‌স অফ্‌ বাংলাদেশ, নৃতত্ত্ব বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৭৯।

১৬। এ্যান্টিস্লেভারি সোসাইটির ইউনাইটেড নেশনস্‌ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইণ্ডিজেনাস পপুলেশনস্‌-এর উপর রিপোর্ট, ১লা আগষ্ট, ১৯৮৪, লণ্ডন।

১৭। বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, প্রকাশক কালিশংকর দেওয়ান, নিউ রাঙামাটি, ১৯৬৯।

১৮। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশন নং ১২৩ পি. পি., ১লা মে, ১৯০০।

১৯। বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন, ১৮৮১, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১।

২০। বিমল কে. পাল, দি কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম, ইট্‌স ইমপ্যাকট অন দি ট্রাইবেল পিপল অফ্‌ দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্‌, ভূগোল বিভাগ, মানিটাবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৮০।

২১। ব্রায়ান এ্যাডস, থাউজ্যাণ্ডস ট্র্যাপড ইন বাংলাদেশ টেরর্‌, দি অবজারভার, লণ্ডন ২০শে অগাষ্ট, ১৯৭৮।

২২। ব্রায়ান এ্যাডস, ম্যাসাকর ফিয়ারড ইন বাংলাদেশ, দি অবজারভার, লণ্ডন, ১৫ই মার্চ, ১৯৮১।

২৩। বাংলাদেশ পিপলস্‌ ডেমক্র্যাটিক মুভমেণ্ট, লণ্ডন, একটি রিপোর্ট, ১৯৮১।

২৪। বাংলাদেশ পিপল্‌স্‌ ডেমক্র্যাটিক মুভমেণ্ট, প্লানড এথনোসাইড অফ্‌ মাইনরিটিস ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, লণ্ডন, ১৯৮১।

২৫। বুডিডস্ট মাইনরিটি প্রটেকশন কমিটি, স্মারকপত্র, বনমালিপুর, আগরতলা, ১৮ই জুলাই ১৯৭৯।

২৬। বি. কে. জোসী, টেরর্‌ কেম্পেন ইন চিটাগাং, দি টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১লা এপ্রিল, ১৯৮০।

২৭। ব্যাংকক পোষ্ট, টেনসন হাই এজ রিফিউজিস ফ্লি ফ্রম বাংলাদেশ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

২৮। বি. আহমেদ, চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ইনেপট হ্যাণ্ডলিং, দি নিউ নেশন, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৮১।

২৯। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে '৮৪, ঢাকা।

৩০। সি. জনসন, হি হু লেস ডাউন হিস গান লেস ডাউন হিস ফ্রিডম,. আই. ডব্লিউ. জি. আই. এ. নিউজ লেটার, জুন, অক্টোবর, ১৯৮১।

৩১। সি জনসন, নো ল্যাণ্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ৭ম ইউরোপিয়ান কনফারেন্স অন মডার্ণ এশিয়ান স্টাডিস উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধ।

৩২। সি. মুরহ্যাড, বাংলাদেশ ট্রাইবসম্যান হেল্ড ক্যাপটিব ইন পিট্‌স, দি টাইমস, ৩১শে মার্চ, লণ্ডন, ১৯৮০।

৩৩। সি. মুরহ্যাড, হিল ট্রাইবস ফাইট ঢাকা গভর্ণমেণ্ট, দি টাইমস, ১৬ই ডিসেম্বর, লণ্ডন, ১৯৮০।

৩৪। সি. মুরহ্যাড, বাংলাদেশ সেস চিটাগাং হিল ট্রাইবস ল লেসনেস প্রবকড বাই টেররিস্ট, দি টাইমস, লণ্ডন, ২৭শে জুলাই ১৯৮১।

৩৫। চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার সাইফুদ্দীন আহ্‌মেদের ইস্যাকৃত সরকারি গোপন চিঠি, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৩৬। ডেভিড সোফার, পপুলেশন ডিজলোকেসন ইন দি চিটাগাং হিল্‌স, দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ, ভল্যুম এল নং ৩ (১৯৬৩)।

৩৭। ডেভিস, ডি, সি. (সম্পাদিত), হোয়েন মেন রেভল্ট এ্যাণ্ড হোয়াই লণ্ডন, ফ্রি প্রেস, ১৯৭১।

৩৮। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, দি রেভল্ট ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ২৯শে এপ্রিল, বোম্বে, ১৯৭৮।

৩৯। ইত্তেফাক, দৈনিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে, ঢাকা, ১৯শে জুন, ১৯৮০।

৪০। গণকণ্ঠ, দৈনিক, উপজাতিদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি পুনর্বাসন, ১৬ই অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৮০।

৪১। গণকণ্ঠ, দৈনিক, কল্পমপতিতে বহিরাগত শরণার্থী। পাহাড়ী জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাবে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে, ঢাকা, ৬ই আগষ্ট, ১৯৮০।

৪২। গণকণ্ঠ, দৈনিক, উপজাতি সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবি, ঢাকা, ৫ই অক্টোবর, ১৯৮০।

৪৩। গার্ডিয়ান, দি ম্যালেরিয়া ডেথ্‌স, ৩রা অক্টোবর, লণ্ডন, ১৯৮৩।

৪৪। গুর, টি. আর., হোয়াই মেন রেবেল; প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭০।

৪৫। এইচ. এন. পণ্ডিত, র‍্যাডক্লিপ সোড চাকমাস রিপ., অমৃত বাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১১ই মে, ১৯৮০।

৪৬। এইচ. ভি. হাডসন. দি গ্রেট ডিভাইড, লণ্ডন।

৪৭। আই. এফ-ও-আর-এর ইউরোপিয়ান সদস্যের রিপোর্ট, ১৯শে মার্চ, নেদারল্যাণ্ড, ১৯৮৩।

৪৮। আই. এফ. ও. আর-এর রিপোর্ট, দি নিউওয়েষ্ট সিচুয়েশন ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ডিসেম্বর, নেদারল্যাণ্ড, ১৯৮১।

৪৯। আই. এফ. ও. আর-এর রিপোর্ট, নিউ থ্রেট টু চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, নেদারল্যাণ্ড, ১৯৮১।

৫০। আই. ডব্লিউ. জি. আই-এর নিউজলেটার, বাংলাদেশ ট্রাইবেল ফাইট ফর ল্যাণ্ড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, নং ২৭, জুন, লণ্ডন, ১৯৭৯।

৫১। জগলুল আলম, ইসটাইলিটি ইন দি হিলস., সাপ্তাহিক হলিডে, ১১ই মে, ঢাকা, ১৯৮০।

৫২। জনসংহতি সমিতি, এ্যান এ্যাকাউন্ট অফ্ চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ১৪ই জুলাই, ১৯৮২।

৫৩। জনসংহতি সমিতির আবেদন, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮০।

৫৪। জন বডলে, ভিক্টিমস্ অফ্ প্রগ্রেস, কামিংস পাবলিশিং কোং, কালিফোর্নিয়া, ১৯৭৫।

৫৫। এ্যানথ্রপলজি এ্যাণ্ড দি কনটেমপরারি হিউম্যান প্রবলেম, ওয়াশিংটন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮।

৫৬। জন আলেকজাণ্ডার, এ্যাক্রস এ ডেভলপমেন্ট চেজম, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮১।

৫৭। জ্যোতি সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ ইন ব্লাড এ্যাণ্ড টিয়ারস, নয়া প্রকাশ, কলকাতা।

৫৮। জে. এন. কাউল, প্রবলেম অফ, ন্যাশনাল ইনটিগ্রেসান. পিপল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৬৩।

৫৯। জেমস এইচ. ফরেস্ট, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে আই. এফ. ও. আর-এর চিঠি।

৬০। জাসদের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২৯শে মার্চ, ১৯৮০।

৬১। যুগান্তর, দৈনিক, বাংলাদেশের হাজার হাজার চাকমার ত্রিপুরায় প্রবেশ, ১লা আগষ্ট, ১৯৮১।

৬২। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবনকাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, রাঙামাটি ১৯৭০।

৬৩। কাজী মন্টু, দি সিচুয়েশন ইন দি হিল ট্র্যাকটস, সাপ্তাহিক হলিডে, ঢাকা, মার্চ, ১৯৮০।

৬৪। কাজী মন্টু, হিল ট্র্যাকস সিচুয়েশন আন অলটারড, সাপ্তাহিক হলিডে, ঢাকা, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৮১।

৬৫। কাজী মন্টু, ট্রাইবেল ইনসারজেনসী ইন দি হিল ট্র্যাকটস, ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, বোম্বে, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

৬৬। কাজী মন্টু, লাইফ ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, সাপ্তাহিক হলিডে, ৬ই জুলাই, ঢাকা, ১৯৮০।

৬৭। লুইন, টমাস এইচ. লেঃ কর্ণেল, এ ফ্লাই অন দি হুইল, কনষ্টেবল এ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, লণ্ডন, ১৯১২।

৬৮। এল. এস. এস. ও. মেলেরি, ইস্টার্ণ বেংগল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, চিটাগাং, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯০৮।

৬৯। ল্যাণ্ড রিফোর্ম কমিটি সাবমিট রিপোর্ট, বাংলাদেশ হাই কমিশন, লণ্ডন, নিউজ বুলেটিন, ১-১৫ এপ্রিল, ১৯৮০।

৭০। ল্যারি কলিন্স এ্যাণ্ড ডমিনিক লাপ্যায়ারে, মাউন্টবেটেন এ্যাণ্ড দি পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৮২।

৭১। এম. কিউ. জামান, ট্রাইবেল ইস্যুস এ্যাণ্ড ন্যাশনাল ইনটিগ্রেসান, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, কেস, এম. এস. কোরাইসি সম্পাদিত, ট্রাইবেল ক'লচারস ইন বাংলাদেশ, ১৯৮৪তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তকের একটি প্রবন্ধ।

৭২। এম. কিউ. জামান, ক্রাইসিস ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, এথ্নিসিটি এ্যাণ্ড ইনটিগ্রেসন, ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম-নং ৩ (১৯৮২), বোম্বে।

৭৩। এম. কিউ. জামান, ট্রাইবাল সারভাইব্যাল ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস অফ বাংলাদেশ, ম্যান ইন দি ইণ্ডিয়া, ভল্যুম ৬৪ (৪), ১৯৮৪।

৭৪। এম. রাম. প্লেগ অন অল পার্টিস, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮১।

৭৫। এম. এম. হক, গভর্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশন এ্যাণ্ড আণ্ডার ডেভলপমেণ্ট, এ স্টাডি অফ ট্রাইবাল পিপলস অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ, ইনষ্টিটিউট অফ লোকেল গভর্ণমেণ্ট, ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম, ডিসেম্বর, ১৯৮২।

৭৬। মাইকেল রোচ্, জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, নিউজ লেটার অফ বুড্ডিস্ট পীস ফেলসিপ অফ আমেরিকা।

৭৭। মর্ণিং নিউজ, চাকমা ট্রাইব ক্রসিং ইনটু ত্রিপুরা, করাচী, ৬ই জুলাই, ১৯৮১।

৭৮.। মিলন দত্ত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারত রত্ন ইন্দিরা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আগষ্ট, ১৯৭৩।

৭৯। মুসলিম, দি, এ হেইনাস ইভেণ্ট, ইসলামাবাদ, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০।

৮০। ন্যাশনাল কমিশন ফর জাষ্টিস এ্যাণ্ড পীস, দি ল্যাণ্ড প্রবলেমস্ অফ হিল ট্রাইবেলস, ঢাকা, ১৯৭৩।

৮১। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২।

৮২। পরেশ সাহা, মুজিব হত্যার তদন্ত, কলকাতা।

৮৩। পিটার নিসওয়াণ্ড, আপ্ হিল প্রবলেম ফর চিটাগাং ট্রাইবসম্যান, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ২৯শে জুলাই, ১৯৮১।

৮৪। পিটার নিসওয়াণ্ড, ঢাকা সীস্ ইণ্ডিয়ান বিহাইণ্ড রেইডস, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ১১ই নভেম্বর, ১৯৮১।

৮৫। প্যাট্রিক কীট্লী, জেনোসাইড পলিসি এ্যালেজড্ ইন বাংলাদেশ, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

৮৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার আলি হায়দার খানের ইস্যুকৃত সরকারি গোপন চিঠি, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৮৭। রায়মোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, কলকাতা, ১৯১৮।

৮৮। আর. এইচ. স্নিড. হাসিনসন, এ্যান এ্যাকাউন্ট অফ্ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯০৬।

৮৯। রেগুলেসন IV, ১৯২০, পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধনী) রেগুলেসন, বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০৬৫ পি., ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২০, ক্যালকাটা গেজেট, ১৯২০, পি. টি ১।

৯০। রেগুলেসন IV, ১৯২৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধনী) রেগুলেসন, বিজ্ঞপ্তি নং—৬৯১৪, এল, আর, ২৯শে জুন, ১৯২৫, কলিকাতা গেজেট, ১৯২৫, পি. টি.—১।

৯১। রাসেল ষ্টেলার, ভূমিকা, দি মিলিটারি আর্ট অফ পিপলস ওয়ার, জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপের নির্বাচিত প্রবন্ধ, মান্থলী রিভিউ প্রেস, ১৯৭০, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক।

৯২। রাজমাতা বিনীতা রায়, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, রাঙামাটি, ১৯৭৩।

৯৩। রবিন লাসটিগ, ট্রাইবস ফেস জেনোসাইড, দি অবজার্ভার, ১৪ই ডিসেম্বর, লণ্ডন, ১৯৮০।

৯৪। আর. আই. চৌধুরী, ট্রাইবেল লীভারসীপ এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ইনটি-গ্রেসন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭৯।

৯৫। আর. মম এ্যাণ্ড এম. গৌতম, আসপেকটস অফ্ ট্রাইবেল লাইফ ইন সাউথ এশিয়া. স্ট্রাটেজি এ্যাণ্ড সারভাইভ্যাল, বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ণ, ১৯৭৮।

৯৬। রবিন হানবারি টেনিসনের, সারভাইভ্যালের পক্ষে, জেনারেল এরশাদের নিকট চিঠি, ১২ই জুলাই, ১৯৮৪, লণ্ডন।

৯৭। সুর কৃষ্ণ চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১৯৮৩।

৯৮। স্নেহ কুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, আগরতলা, ১৯৮২।

৯৯। সুগত চাকমা, চাকমা পরিচিতি, বরগাঙ পাবলিকেশন্স, রাঙামাটি, অক্টোবর, ১৯৮৩।

১০০। সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, মিডনাইট ম্যাসাকর ইন ঢাকা, কলকাতা।

১০১। সিরাজুল আলম খান, আন্দোলন ও সংগঠন প্রসঙ্গে।

১০২। সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন—১, শামীম সিকদার সম্পাদিত, ঢাকা।

১০৩। সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ, উই ওয়ান্ট ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড নট দি পিপলস, জেনোসাইড ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, লণ্ডন, ১৯৮৪।

১০৪। সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ, চিটাগাং হিল ট্র্যাকট্স, মোর ম্যাসাকর, লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

১০৫। এস, কামাল উদ্দিন, এ পীস অফেনসিভ ইন দি হিল্‌স, ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, ২রা মে, ১৯৮০।

১০৬। এস. কামাল উদ্দিন, এ ট্র্যাংগলড ওয়েভ অভ্ ইনসারজেনসি, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, ২৩শে মে, ১৯৮০।

১০৭। এস. কামাল উদ্দিন, এ ডিসটার্বড নোট সাং ইনটু হারমনি, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক বিভিউ, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮০।

১০৮। এস. কামাল উদ্দিন, রং সাইড অফ্ দি ট্র্যাকটস্, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮১।

১০৯। এস. কামাল উদ্দীন, বেইন এ্যাণ্ড আদার ইলিমেণ্টস, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, ২৬শে মে, ১৯৮১।

১১০। এস. ব্যানার্জী, বাংলাদেশ পারসেকিউটেড ট্রাইবেল্‌স, সানডে, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮১।

১১১। সারাভাইভ্যাল ইণ্টারন্যাশনাল এ্যান্যুয়েল রিভিউ, (১৯৮৩) নং ৪৩, লণ্ডন।

১১২। এস. আর. চক্রবর্ত্তী, টারমোওয়েল ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকট্‌স, ইথ্‌নিক কনফ্লিকট ইন বাংলাদেশ, পঠিত প্রবন্ধ, সেমিনার অন ডমেষ্টিক কনফ্লিকটস ইন সাউথ এশিয়ান স্টেট্‌স ইমারজিং ট্রেণ্ড, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, ১৮-২০ অক্টোবর, ১৯৮৪।

১১৩। সুনন্দ কে. দত্ত. রায়, চিটাগাং বুড্ডিস্ট ফিয়ার ডেথ্ ইন দি জংগল. দি অবজার্ভার, ২৭শে এপ্রিল. লণ্ডন, ১৯৮০।

১১৩। সুনন্দ কে, দত্ত, রায়, ট্রাবল ইন রাঙামাটি, বুডিড্স্ট স্ট্রাগল ফর সারভাইভ্যাল, দি স্টেটসম্যান উইকলি, ১৭ই মে, ১৯৮০।

১১৪। সাইমন উইনচেষ্টার, সানডে টাইম্‌স, ২৭শে মার্চ. লণ্ডন ১৯৮৩।

১১৫। সাইমন উইনচেষ্টার, বুডিড্স্ট ট্রাইব স্লটারড ইন জংগল জেনোসাইড, দি সানডে টাইমস, লণ্ডন, ১৪ই অকটোবর, ১৯৮৪।

১১৬। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস ইন বাংলাদেশ, ইনটিগ্রেশানাল ক্রাইসিস বিটুইন দি সেণ্টার এ্যাণ্ড পেরিফেরি, এশিয়ান সারভে ৩১ (১২)।

১১৭। সেলিম সামাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামে চরম অবস্থা, রাজনৈতিক সমাধান কত দূরে, সাপ্তাহিক রোববার, ২০শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা।

১১৮। সেন্টিন্যাল, দি চাকমা ইনসারজেনসি ইন বাংলাদেশ, গৌহাটি, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

১১৯। সুইডেন সরকারের চিঠি, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১।

১২০। শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্র লাল চাকমা, তিন সংসদ সদস্যের সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮০।

১২১। স্টেটসম্যান উইক্‌লি, দি রিপ্যাটাট্রিয়েসন অফ্ ট্রাইবেলস স্টলড, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮১।

১২২। স্টেটসম্যান উইক্‌লি, দি চিটাগাং রেবেলস মুভ ফর বাফার স্টেট রিপোর্টেড, ১০ই মে, ১৯৮০।

১২৩। স্টেটসম্যান উইক্‌লি, দি, থ্রি থাউজেণ্ড হেল্ড ইন চিটাগাং, ১০ই অকটোবর, ১৯৮১।

১২৪। স্টেটসম্যান উইক্‌লি, দি ফল আউট ইন বাংলাদেশ, ৩রা অকটোবর, ১৯৮১।

১২৫। স্টেটসম্যান উইক্‌লি, দি টাইবেল ইনফ্লাকস, বাংলাদেশ চার্জেস এ্যাগেন্‌স্ট ইণ্ডিয়া, ২২শে অকটোবর, ১৯৮১।

১২৬। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি ফিফ্‌টি বাংলা ট্রাইবেলস কট ট্রাইং টু এনটার ত্রিপুরা, ২৯শে জুন, ১৯৮১।

১২৭। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি স্টির এ্যাগেনেস্ট বাংলা একসেকিউসনস, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, দিল্লি।

১২৮। টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া, দি ম্যালেরিয়া ডেথস, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৩।

১২৯। টাইমস, দি ম্যালেরিয়া ভিক্‌টিমস,, ৩রা অকটোবর, '৮৩ লণ্ডন।

১৩০। টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া, দি এণ্ড ট্রাইবেল ইনফ্লাকস্ বাংলা টোলড, ৩রা জুলাই, ১৯৮১, দিল্লি।

১৩১। টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া, দি মাস্ কিলিংস অফ্ ট্রাইবেলস ইন চিটাগাং, ১২ই জুলাই, ১৯৮১।

১৩২। টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া, দি ডি. পি. পোর ইনটু ত্রিপুরা, দিল্লি, ২৬-শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৩। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি বাংলাদেশ হিল এরিয়া ডেথ রোল ফাইভ হাণ্ড্রেড, দিল্লি, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৪। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি মোর ইনফ্লাকস্ অফ ট্রাইবেল, দিল্লি, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৫। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি স্টপ ট্রাইবেল ইনফ্লাকস্ বাংলা টোলড্. দিল্লি. ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৬। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া দি ট্রাইবেলস্ ইনফ্লাকস, পয়েণ্টাব ট্ ঢাকা. ঢাকাস চেঞ্জড পলিসি, ১লা অকটোবর, ১৯৮১ দিল্লি।

১৩৭। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি ঢাকা ওকে এণ্ডয়েটেড অন ডি পি. ইস্যু, ৪ঠা অকটোবর, ১৯৮১, দিল্লি।

১৩৮। টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া. দি বাংলা ট্রাইবেলস ফোবসড্ টু ফ্লি, ৫ই অক্টোবর, ১৯৮১, দিল্লি।

১৩৯। টাইমস, দি হিল ট্রাইবস ডিলেমা ফর জিয়াস সাকসেসর, লণ্ডন ২৯-শে জুলাই, ১৯৮০।

১৪০। টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া. দি এসকেপ্ ফ্রম টেরর, দিল্লি, ১লা অক্টোবর, ১৯৮১।

১৪১। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি বাংলা ইগনোরস বি. এস. এফ. প্রপোজল, দিল্লি ১লা অক্টোবর, ১৯৮১।

১৪২। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি বাংলাদেশ রাইফেলস্ এ্যাডমিটস টু একেসোডাস, দিল্লি, ১০ই অক্টোবর, ১৯৮১।

১৪৩। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি ইনফ্লাকস্ অফ্ বাংলা অন, দিল্লি, ১৩ই অক্টোবব, '৮১।

১৪৪। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি রিপ্যাটট্রিয়েসন অফ্ ট্রাইবেলস্ টু বাংলা সুন, দিল্লি, ২০শে নভেম্বর, ১৯৮১।

১৪৫। টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, দি রিফিউজি চিলড্রেন ডাইং লাইক ফ্লাইস্, দিল্লি, ২২শে নভেম্বর, ১৯৮১।

১৪৬। তাপস মজুমদার এবং সেলিম সামাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ঘটছে, সাপ্তাহিক রোববার, ভল্যুম-৩৪, জুন, ১৯৮০।

১৪৭। উলফ গেং মে, ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি এণ্ড সোসাল রেজিস্ট্যান্স ইন দি থার্ড ওয়ার্লড, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস কেস, জেনোসাইড ইন কনটেকস্ড, কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যালয় 'আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, এপ্রিল, ১৯৮৩।

১৪৮। উলফ গেং মে জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস কেস, ৭-১১ জুলাই, ১৯৮১ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ৭ম ইউরোপীয় কনফারেন্স অন মডার্ণ এশিয়ান স্টাডিস, উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ।

১৪৯। উল্‌ফ গেং মে, পলিটিক্যাল সিস্‌টেম ইনদি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, বাংলাদেশ, মাইমেও পেপার, বার্লিন, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী, ১৯৭৮।

১৫০। উলফ গেং মে, এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অফ সোসিও ইকনমিক রেঞ্জ এমণ্ড দি এথনিক গ্রুপস এণ্ড কমিউনিটি অফ্ দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, বাংলাদেশ।

১৫১। উল্‌ফ গেং মে, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস কেস্, এ বাংলাদেশী আণ্ডারস্টেণ্ডিং অফ্ হিউম্যান রাইটস, আই. সি. এস. এর উদ্যোগে আয়োজিত এনট্রপলজি অফ্ হিউম্যান রাইটস সিম্পজিয়ামে পঠিত প্রবন্ধ, কানাডা, ১৯৮৩।

১৫২। উপেন্দ্রলাল চাকমা, এম. পি., কাউখালি ম্যাসাকার, বাংলাদেশ আর্মি স্লটারস সিভিলিয়ানস্ ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, প্রেস কনফারেন্স, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮০।

১৫৩। উলরীচ্ হেনস্, দি সিক্রেট ওয়ার ইন বাংলাদেশ, আই.এফ.ও.আর এর রিপোর্ট, অক্টোবর, ১৯৮০, নেদারল্যাণ্ড।

১৫৪। ডব্লিউ. ই.ওয়েব, ল্যাণ্ড ক্যাপাসিটি ক্লাসিফিকেসন এণ্ড ল্যাণ্ড ইউজ প্লানিং ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস অফ্ ইষ্ট পাকিস্তান, ষাট বিশ্ববন কংগ্রেস, ভল্যুম III, মাদ্রিদ, ১৯৬৬।

১৫৫। জুলফিকার আলি ভুট্টো, ইফ আই এ্যাম এ্যাসাসিনেটেড, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লি, ১৯৭৯।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
২	বর্ত্তাত্য	পার্বত্য
৭	চরপন্থী	চরমপন্থী
১০	তাড়ংশক্তি	তড়িৎ শক্তি
১১ও১৪	ভুবন মোহন রায়	নলিনাক্ষ রায়
১১	পর্ষবসিত	পর্য্যবসিত
১২	কংগ্রেসী এক কমিটি	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাবকমিটি
১২	কামিনী মোহন দেওয়ান	কামিনী মোহন দেওয়ান
১৩	বেলবেড়িয়া	বেলবেডিয়া
১৫	অন্তভূক্ত	অন্তর্ভূক্ত
১৬	পাবত্য	পার্বত্য
১৭	বৃটিশ ইণ্ডিয়া	বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া
১৮	মর্ষাদা	মর্যাদা
২৩	Let	Led
২৮	পাইনি	পায়নি
২৮	Corp	Crop
৩২	চাকম	চাকমা
৩৫	নেত্বেত্বে	নেতৃত্বে
৪০	চব্বিব	চব্বিশ
৪৪	জাতিয়তাবাদ	জাতীয়তাবাদ
৫৩	রমহান	রহমান
৬২	খোন্দাকার	খোন্দকার
৭৩	সুবিদার্থে	সুবিধার্থে
৭৫	রুরার	করার
৭৫	অথনৈতিক	অর্থনৈতিক
৭৬	দীদিনালা	দীঘিনালা
৭৮	ananse	anange
৯১	antonomy	autonomy

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
৯১	Self-rula	Self-rule
৯৪	ত্বুটতে	ত্রুটিতে
১০১	ত	মত
১০১	পড়ন	পড়ান
১০১	পাবিস্তান	পাকিস্তান
১০৬	বিজয়	বিজয়ে
১১২	offend	offered
১১২	ধরণরে	ধরণের
১১৫	গেষ্ঠী	গোষ্ঠীর
১১৯	জত্যাভিমান	জাত্যাভিমান
১২০	সশস্ত্র	সশস্ত্র
১২৩	Eritea	Eritrea
১২৭	ত্রিবিদ	ত্রিদিব
১৩৯	রাজকৈতিক	রাজনৈতিক
১৪০	sessiofs	sessions
১৪১	enductments	enactments
১৪২	section	sanction
১৪২	inconsident	inconsistent
১৪৪	firear	firearms
১৪৪	possessio	possession
১৪৪	withdraw	withdrawn
১৪৭	Motns	Months
১৪৬	Liquor manufactred	Liquor manufactured
১৪৬	geseral	general
১৪৭	justic	justice
১৫০	fowarded	forwarded
১৫০	Gort	Court
১৫০	Ordes	Orders
১৫০	usit	suits
১৫১	chife	chief

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
১৫২	be shall	be he shall
১৫৩	Agenst	Agents
১৫৫	copid	copied
১৫৬	sun sul	sul
১৫৬	attented	attested
১৫৬	pluogh	plough
১৫৬	sabestitute	substitute